এম এ কে লোদি সম্পাদিত

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনের ইসলামায়ন

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনের ইসলামায়ন

এম এ কে লোদী সম্পাদিত

অনুবাদ
মোঃ খায়রুল আলম

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনের ইসলামায়ন

ইংরেজি সম্পাদনা : এম এ কে লোদী
বাংলা অনুবাদ : মোঃ খায়রুল আলম

ISBN
984-70103-0008-6

প্রকাশকাল
কার্তিক ১৪১৫
শাওয়াল ১৪২৯
অক্টোবর ২০০৮

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)
বাসা # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর #০৯, উত্তরা মডেল টাউন,ঢাকা-১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৯১১৪৭১৬, ০৬৬৬২৬৮৪৭৫৫, ০১৫৫৪৩৫৭০৬৬
ফ্যাক্স (০২)৮৯৫০২২৭, মেইল : biit_org@yahoo.com

মূল্য
একশত পঞ্চাশ টাকা

মুদ্রণ
তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

Biggan o projuktite Dristivangi o Onushiloner Islamayan (Bangali Version of the book *Islamization of Attitudes and Practices in Science and Technology edited in English by M.A.K.Lodi* translated into Bengali by Muhammad Khairul Alam, published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka,Bangladesh, Phone:8950227,9114716,06662684755, 01554357066, Fax: 02-8950227 E-mail: biit_org@yahoo.com. Price : Taka 150, $ 15.

প্রকাশকের কথা

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। কিন্তু আজকের মুসলিম সমাজ এ ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে, অথচ মধ্যযুগের মুসলমানদের হাতেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। অন্যদিকে উন্নত বিশ্বের অভিনব সব আবিষ্কার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাদেরকে নিয়ে গেছে উন্নতির চূড়ায়। যদিও এসব ক্ষেত্রে নৈতিক ভাবধারা এবং মানবিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যার ফলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুবিধা ভোগ করার ক্ষেত্রে প্রায়ই সাধারন মানুষকে বিশেষ করে মুসলমানদেরকে নৈতিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। এই সংকট থেকে উত্তরনের অন্যতম উপায় হচ্ছে মধ্যযুগের মুসলিম গবেষকদের পথ অনুসরণ করে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষনায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাকে ইসলামী শিক্ষার মূলনীতির সাথে সংগতিপূর্ণ করার উদ্যোগ নেয়া।

ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (আইআইআইটি) এবং ইসলামিক এসোসিয়েশন অব মুসলিম সাইনটিষ্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারস্ কর্তৃক আয়োজিত *'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে জ্ঞানের ইসলামীকরণ(১৪০৮-১৯৮৯)'* শীর্ষক অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়- যেগুলোর সংকলিত রূপ *Islamization of Attitudes and Practices in Science and Technology'* বইটি।

বইটিতে স্থান পাওয়া এসব প্রবন্ধে সমসাময়িক বিশ্বের মুসলিম বিজ্ঞানীদের আদর্শ, ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা এবং পরিবেশের আলোকে *বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দৃষ্টিভংগি ও অনুশীলনের* চ্যালেঞ্জ সমূহকে যথার্থভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বইটিতে ১৩ জন খ্যাতনামা মুসলিম বিজ্ঞানী তাদের বিশেষায়িত বিষয়সমূহের উপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন- যা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল বিজ্ঞানী/স্কলারদের ভবিষ্যত উন্নয়নের অন্যতম উৎস বা নির্দেশক হিসেবে কাজে লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তাই এমন একটি গ্রন্থ পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে বিআইআইটি সত্যিই আনন্দিত। আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

মুহাম্মদ আবদুল আজিজ

উপ-নির্বাহী পরিচালক

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য এবং দরুদ ও সালাম রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি। ১৯৮৭ সনে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান বিষয়ক একটি সেমিনারে উপস্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলোর সমন্বয়ে Islamization of Attitudes and Practices in Science and Technology শীর্ষক একটি গ্রন্থ সংকলন করা হয়। সংকলন করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গবেষক ও লেখক এম এ কে লোদী। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি) গ্রন্থখানি অনুবাদ করার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করে।

সাহিত্যের ছাত্র হয়ে বিজ্ঞান বিষয়ের একটি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা বেশ কঠিন জেনেও সাহস হারাইনি। বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে পেরে আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'য়ালার দরবারে লাখো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতেও রয়েছে ইসলামের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা- এ সত্যটি প্রতিফলিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধে যা সাধারণ পাঠক ও গবেষক সকলের জ্ঞাতার্থে বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করার প্রয়োজন আছে। বাংলা অনুবাদে বইটির নাম দেয়া হয়েছে *'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দৃষ্টিভংগির ইসলামায়ন।'*

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণার সময় কিভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে ওহীর জ্ঞান তথা কোরআন ও হাদীসের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে মূল গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধেই তার চমৎকার দৃষ্টান্ত ও পদ্ধতি উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলা ভাষী পাঠকবৃন্দ এ গ্রন্থ থেকে বিশেষ উপকার পাবেন বলে আশা করি। কোন কোন প্রবন্ধে প্রবন্ধকার আল কোরআনের অনেক আয়াতের রেফারেন্স দিয়েছেন। অনুবাদে পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো আরবীতে লিখে তার বাংলা তরজমা দেয়া হয়েছে।

প্রবন্ধগুলো নির্ভেজাল বিজ্ঞান বিষয়ে লিখিত হওয়ায় অনুবাদে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ক্ষেত্র বিশেষে বাংলা উচ্চারণে লেখা হয়েছে এবং টেবিল সমূহ ও রেফারেন্স বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাংলায় অনুবাদ না করে ইংরেজিতেই রেখে দেয়া হয়েছে। চেষ্টা করেছি প্রবন্ধ সমূহের মূলভাব ও বক্তব্য অক্ষুন্ন রাখতে এবং বিজ্ঞানের মত একটি নিরস বিষয়কে যতদূর সম্ভব সহজ ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরতে। ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই বইটির অনুবাদ সম্পর্কে সম্মানিত পাঠক বৃন্দের কোন সংশোধনী মূলক পরামর্শ থাকলে তা সাদরে গৃহীত হবে।

গবেষণাধর্মী ও সৃষ্টিশীল কাজে আত্মনিয়োগ করা বিশেষ করে আলোচ্য বইখানি অনুবাদের ক্ষেত্রে দু'জন সুহৃদ আমাকে সব সময় উৎসাহ দিয়েছেন। তারা হলেন শ্রদ্ধেয় মেজর (অবঃ) মোঃ ইউনুস আলী ও ভাই আবদুল আজিজ। আমি তাদের কাছে ঋণী। এছাড়া আমার সহধর্মিনী সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদান করে অনেক ব্যস্ততার মাঝেও অনুবাদের কাজটি সম্পন্ন করতে আমাকে সাহায্য করেছেন, এজন্য তার প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি বিআইআইটির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাছ থেকেও পেয়েছি আন্তরিক সহযোগিতা।

আল্লাহ আমাদের সকলের নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন আমিন।

মোঃ খায়রুল আলম
বনানী, ঢাকা-১২১৩
২৪ রমাদান ১৪২৯ হিজরী
২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين

পরম করুণাময় ও দাতা আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক এবং দুরূদ ও সালাম তাঁর শেষ নবী ও রাসূলের প্রতি।

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ـ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ـ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ـ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

'পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পাঠ কর। আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে যা সে জানত না।' (সূরা আলাক ৯৬ : ১-৫)

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

'এবং আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' (সূরা আন-নাহল ১৬ : ৭৮)

সূচি

আগস্ট ১৯৮৯

ভূমিকা

একজন মুসলিম বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি পুনঃমূল্যায়নের পদক্ষেপ

গত ২৭ মার্চ ১৯৮৭ মোতাবেক ২৮ জমাদিউল আখির ১৪০৮ হিজরী ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত হয় 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনের ইসলামায়ন' শীর্ষক একটি ওয়ার্কশপ। এ ধরনের ওয়ার্কশপ এটাই প্রথম। যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত কতিপয় সম্মেলন ও কনভেনশনে যে সকল বিষয় আলোচিত হয়েছিল তারই সূত্র ধরে আলোচ্য ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর আমেরকিায় বসবাসরত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রতিভাবান কিছু মুসলমান। এসব পণ্ডিতজনেরা মুসলিম উন্মাহর বর্তমান সমস্যা ও সংকটে বেশ উদ্বিগ্ন এবং তারা এ সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় তালাশ করছেন। সুতরাং এ সকল বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও চিকিৎসকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান সমস্যাবলী আলোচনা করতঃ সেগুলোর সমাধানের উপায় বের করার একটা সুযোগ সৃষ্টি হলো এ সম্মেলনে। সে সাথে মুসলমানরাই যে দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি আল-কুরআনে বর্ণিত এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার অঙ্গীকার গ্রহণের সুযোগও সৃষ্টি হল। সম্মেলনে যে বিবষয়টির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয় তা হলো সমকালীন বিশ্বের একজন মুসলিম বিজ্ঞানীর আদর্শ, ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদি অবস্থার আলোকে এবং অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রেখে আধুনিক যুগে বিজ্ঞান চর্চার সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা। যাহোক, এ ওয়ার্কশপকে শুধু চিন্তা ও কল্পনার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবতার আলোকে একে মূল্যায়ন করার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়।

মুসলিম উম্মাহ শ্রেষ্ঠ উম্মাহ এবং মানব জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করাই উম্মাহর দায়িত্ব। দুঃখজনক হলেও সত্য, উম্মাহ আজ নানাভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত। সার্বিক অবস্থা হলো মুসলমানরা আজ দুর্বল, প্রযুক্তিগতভাবে অনুন্নত, বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় পশ্চাৎপদ এবং শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। বিশ্ব নেতৃত্বের জন্য উম্মাহর দায়িত্বের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বহু মুসলিম নেতা, চিন্তাবিদ, পণ্ডিত, বিজ্ঞানী ও অন্যান্য পেশাজীবীদেরকে এক মঞ্চে সমবেত করা হয়েছিল এ ওয়ার্কশপের মাধ্যমে। মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের মধ্যে সমকালীন সকল ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা সৃষ্টির প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয় এ ওয়ার্কশপে।

এ উদ্যোগের শুরুতেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উম্মাহ যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য একটা ফোরাম উন্মুক্ত করা হয়।
অতীত নিয়ে আত্মতৃপ্তি বোধ করা বা নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য অন্যকে দোষারোপ করা ওয়ার্কশপের লক্ষ্য ছিল না, এর উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতা সৃষ্টি করা এবং কেন আমরা ব্যক্তি পর্যায়ে বা জাতিগতভাবে নিজেদের উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারছি না সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা। আমাদের জানতে হবে কেন আমরা সাম্প্রতিক শতাব্দীতে নিজেদেরকে অনুকরণের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি, কেন আমরা নিজেদের স্বকীয়তা ও মৌলিক পরিচয় হারিয়ে ফেলেছি। অন্যরা যেখানে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে, সেখানে কোন্ জিনিষ আমাদের গতিকে স্থবির করে দিয়েছে?

জ্ঞানের ইসলামায়নের ক্ষেত্রে মুসলিম বিজ্ঞানীদের জ্ঞান ও মন-মানসিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কিভাবে ইসলামী ভাবধারা লালন ও বাস্তবে তা অনুশীলন করা যায় তা নিয়ে আলাপ আলোচনা করাই ছিল এ ওয়ার্কশপের লক্ষ্য। ইসলামায়নের এ প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ ছিল প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাযথ কর্মপদ্ধতি ঠিক করা এবং সমকালীন জ্ঞান জগত ও কর্মপদ্ধতিতে তা ছড়িয়ে দেয়ার উপায় বের করা। আমাদের সৌভাগ্য যে, জ্ঞানের ইসলামায়নের ধারণা ও প্রক্রিয়া রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর সময় থেকেই প্রচলিত ছিল বিভিন্ন কায়দায়। এক্ষেত্রে ইসলামী আইন বিজ্ঞানের কথা উল্লেখ করা যায় সর্বাগ্রে। ইসলামায়ন নীতিমালার বিবর্তনে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রে ইসলামী আইন বিজ্ঞানের অবদান সবচেয়ে বেশি। প্রকৌশল ও প্রযুক্তিসহ আধুনিক বিজ্ঞানের যেসব কথা আমরা বলি এসবের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল মধ্যযুগের মুসলমানদের হাতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এর কোনটাতেই আজ ইসলামী ভাবধারা ও মানসিকতার চিহ্ন বিদ্যমান নেই। উম্মাহর প্রতি মুসলিম বিজ্ঞানীদের এটা একটা নৈতিক দায়িত্ব যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইসলাম যে ভাবধারা লালন করে তা পুনরুজ্জীবিত করা।

ওয়ার্কশপ অধিবেশনে অনানুষ্ঠানিক আলোচনার সুযোগ রাখা হয়েছিল। এটা পারস্পরিক মত বিনিময় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা ও লক্ষ্য চিহ্নিত করার কাজে সহায়ক হয়েছিল। অনানুষ্ঠানিক সেশনে বিশ জনের বেশি আলোচক রাখা হয়নি। আলোচনা অনানুষ্ঠানিক হলেও প্রত্যেক আলোচকেরই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার সুযোগ ছিল। প্রতিটা সেশনেই একটা নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে আলোচনা পরিচালিত হয়েছে। নিম্নলিখিত লক্ষ্যসমূহকে টার্গেট করে আলোচনা গতি লাভ করে :

ক. নতুন কাজের আলোচনা, খ. মাঠ পর্যায়ে যারা কাজ করে থাকে তাদের মধ্যকার মতবিরোধ ও মত পার্থক্য দূরীকরণ, গ, চিন্তা ও প্রাসঙ্গিক কর্ম পদ্ধতির মধ্যকার বন্ধন

শক্তিশালী করা। ঘ. চলমান ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর ব্যাপারে মতৈক্যের ফর্মুলা তৈরি করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা।

প্রায় ১১ জন আলোচক তাদের প্রেজেন্টেশন পেপার জমা দিয়েছিলেন এবং শুরুতে তাদেরকে প্রায় ১০ মিনিট করে সময় দেয়া হয়েছিল অনানুষ্ঠানিক বক্তব্যের জন্য যাতে আলোচনা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আলোচকগণ পুরো সেশনটাতেই উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। প্রত্যেক সেশনের প্রতিবেদক ৫ থেকে ১০ মিনিটের একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। তারপর শুরু হয় প্যানেল আলোচনা। শেষ অধিবেশনের প্রতিবেদক ১৫ মিনিটের একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদককে সহযোগিতা করেন আলোচনার সচিবগণ (প্রতি সেশনে একজন করে), সাথে ছিল টেপ রেকর্ডার ও প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে জ্ঞান অর্জন ও অনুশীলনকে কিভাবে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যায় সেটাই ছিল ওয়ার্কশপের আলোচনার পরিসর :

১. মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণা ও গবেষণা প্রশাসন;

২. প্রতিকুল পরিবেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণা ও শিক্ষা;

৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অন্যান্য নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র;

৪. ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কি হওয়া উচিত।

ওয়ার্কশপে আলোচকবৃন্দ কর্তৃক দাখিলকৃত পেপারগুলো পঠিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। পেপার উপস্থাপনকারী পেপার উপস্থাপন শেষে প্রশ্ন আহ্বান করেন। এতে বিষয় বস্তুর উপর সাধারণ আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং অংশগ্রহণকারীগণ সমস্যার দিকগুলো চিহ্নিত করতঃ তা সমাধানের সুপারিশ করেন।

আশা করি এ ওয়ার্কশপ আমাদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে ও তার সহজ সমাধান খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে। সর্বোপরি, ওয়ার্কশপ আয়োজনের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে আশা করা যায় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটা উন্নত মানসিক অবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে ওঠার দিক নির্দেশনা পাবে এবং উন্নত মন-মানসিকতা, নৈতিক দৃঢ়তা, যোগ্যতা ও পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

এম এ কে লোদী — মুহররম ১৪১০
লুবক, টেক্সাস — আগস্ট ১৯৮৯

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গির ইসলামায়ন

*তাহা জাবির আল আলওয়ানু**

জ্ঞানের ইসলামায়ন বিষয়ক সেমিনার সিরিজে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট আয়োজিত 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গির ইসলামায়ন' শীর্ষক সেমিনারটি এ ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক। এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারগুলোতে জ্ঞানের ইসলামায়ন সম্পর্কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কোন না কোন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানের বাইরের কোন বিষয় নিয়ে সেমিনারের আয়োজন এটাই প্রথম। ইনস্টিটিউটের এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ও দিগন্ত প্রসারকারী উদ্যোগ নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

ইসলামায়ন প্রক্রিয়ায় সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলো মুখ্য আলোচনায় স্থান পায়। সেই সাথে প্রাকৃতিক ও ফলিত বিজ্ঞানকে এ প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসা একদিকে যেমন প্রাসঙ্গিক, অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণও বটে।

আজকের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ও সমাজ ব্যবস্থার যা অবস্থা তাতে আমাদের চিন্তা-বিদদেরকে একাডেমিক বিষয়সমূহের ইসলামায়নের প্রতি মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। কারণ, শিক্ষার বিভিন্ন দিক ইসলামায়নের আওতায় আনা গেলে বিজ্ঞান ভিত্তিক অনুসন্ধান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দ্বার উন্মোচিত হবে। বিজ্ঞান একটি ধর্মহীন বিষয়– এ ধরনের ধ্যান-ধারণা ঝেড়ে ফেলার সময় এসেছে। বিশেষ করে আমরা যখন দেখি পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘটেছে অসাধারণ উন্নয়ন ও উদ্ভাবন, তখন জ্ঞানের ইসলামায়ন নিয়ে ভাবতে বাধ্য হই এবং এটা মনে করার সংঘাত কারণ সৃষ্টি হয় যে, যেসব মুসলিম বিজ্ঞানী ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিজ্ঞান গবেষণার কাজ করতে চান তারা অবশ্যই তাদের এসব কর্ম ও গবেষণায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটাতে পারেন। তার থেকেও বড় কথা, বিজ্ঞানে বিশ্বাসের একটা ভূমিকা আছে– এ সত্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

ইসলামিক থ্যট বিষয়ে আলজেরিয়াতে যে সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয় তাকে একটা মাইল ফলক হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু তারপরও এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজনে যে পর্যায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়ার কথা তা পাওয়া যায় নি। ২০তম বার্ষিক সিম্পোজিয়ামে বিভিন্ন ট্রপিক্যাল ইস্যু নিয়ে ব্যাপক ভিত্তিক আলোচনার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পণ্ডিতবর্গ। এর পূর্বে যেসব আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইসলামায়ন' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে আয়োজকগণ একমত হতে পারেন নি বা বিষয়টি আলোচনার জন্য গৃহীতও হয়নি।

---

* দি ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, হার্নডন, ভার্জিনিয়া, ইউএসএ

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট যখন উপলব্ধি করল যে, মুসলিম উম্মাহর সমস্যা বস্তুতঃ তাদের চিন্তা জগতের সমস্যা যা সমাজিক বিজ্ঞানের বিষয়। উম্মাহর মন-মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত এ সকল সমস্যা সমাধানের উপায় খোঁজার অর্থ মুসলিম উম্মাহর বস্তুগত উন্নয়নের দিকে নজর দেয়া। এ অবস্থায় জ্ঞানের ইসলামায়নের ব্যাপ্তি সকল শাখায় বিস্তৃত করা প্রয়োজন– এ সত্যের উপলব্ধি থেকে এটিও বের হয়ে আসে যে, ভৌত ও ফলিত বিজ্ঞানের বিষয়সমূহও জ্ঞানের ইসলামায়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট 'জ্ঞানের ইসলামায়নের' সঠিক কর্মসূচীর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে যেভাবে নিয়ে এসেছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানের জগতকে সমাজ বিষয়ক জ্ঞান ও প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান- এ দু'ভাগে ভাগ করার একটা পুরনো রীতি আমাদের সমাজে চালু আছে। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের শাখাগুলোর পার্থক্য বিষয়বস্তু ও এসেন্স এর সাথে সম্পর্কিত, নাকি তা একই বৃক্ষের কাণ্ড থেকে বিস্তৃত দুটি ভিন্ন শাখা যার উৎস একই সেটা ভাবতে হবে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে সমাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জ্ঞান কোনটিই বাদ দেয়ার সুযোগ নেই। মোট কথা, একজন মুসলমানের নিকট জ্ঞানের প্রধান উৎস দুটি- ১. কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে প্রাপ্ত অহীর জ্ঞান, ২. প্রকৃতি, জীবন বা গোটা বিশ্ব তথা সৃষ্টি জগৎ থেকে আহরিত জ্ঞান।

জ্ঞানের এ উৎসসমূহ হতে কল্যাণ লাভ করতে হলে আগ্রহী ব্যক্তির মধ্যে দু'টো জিনিস থাকতে হবে। ১. অনুধাবন করার ক্ষমতা, ২. যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা।

যে বিষয়টি বিবেচ্য তা হল জ্ঞানের প্রকৃতি বা ধরন কি জন্মগত নাকি অর্জন সাপেক্ষ? এ বিতর্কের কোন শেষ নেই। তার্কিক ও দার্শনিকগণ এ নিয়ে অন্তহীন বিতর্কের অবতারণা করেছেন। কেউ বলেছেন জ্ঞানের সবটুকুই অর্জন করতে হয়, কেউ বলেন এটা মানব সত্তায় জন্মগতভাবেই নিহিত থাকে। অন্য আরেক দল বলেন জ্ঞান কিছুটা আসে জন্মগতভাবে আর কিছুটা অর্জন করতে হয়। মানুষ বড় হওয়ার সাথে সাথে তার জ্ঞানও বাড়তে থাকে। অনেকে বলেন মানুষ জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়, ধীরে ধীরে ঐ ক্ষমতার মাধ্যমে সে জ্ঞান অর্জন করতে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে সমাজ ও ঘরের পরিবেশ ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তার বিকাশের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে, একটি শিশু মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় কিছুই জানে না। তারপর মহান আল্লাহ তার প্রতি দয়া করে তাকে শুনার, দেখার ও বুঝার এবং ভাল-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা দান করেন। আল্লাহর দেয়া এসব ক্ষমতার (ফিতরাত) সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সমন্বয় ঘটিয়ে মানুষ ধীরে ধীরে জ্ঞান অর্জনের পথে অগ্রসর হতে থাকে এবং আস্তে আস্তে তার মধ্যে জ্ঞানের পরিপক্কতা

আসে। সে কারণে আল্লাহ্ প্রদত্ত এ প্রাকৃতিক ও ক্রমবিকাশমান ক্ষমতার অপব্যবহার করার জন্য কুরআনে অবিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে বার বার। এসব অবিশ্বাসীদেরকে তুলনা করা হয়েছে সেসব মানুষের সাথে যাদের হৃদয় আছে কিন্তু অনুধাবন করে না, চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে দেখে না, কান আছে কিন্তু শুনতে পায় না। এরা পশুর সমান। সুতরাং এটা অনস্বীকার্য যে, মানব আত্মার চূড়ান্ত মুক্তির জন্য জ্ঞানই হচ্ছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ। জ্ঞানের অন্যান্য উৎস সম্পর্কে ইমাম ফকর আল দীন বলেন, জীবন ও জগত থেকে মানুষের জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি তিনটি জিনিসের সাথে সম্পর্কিত–

১. প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অস্তিত্ব;

২. আবেগের অভিজ্ঞতা ও

৩. যুক্তির অস্তিত্ব। মানব মন নিজেই যেহেতু জ্ঞানের উৎস নয়, তাই জ্ঞান অর্জন ও সঞ্চয়, বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিন্যাস এবং প্রয়োজনের সময় তাকে কাজে লাগানোর জন্য মানব মনের সঠিক ব্যবহার অপরিহার্য।

অনেক বিজ্ঞজন মনে করেন, এ বিশ্লেষণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। সেটা হলো মানব মন নৈতিক ও নান্দনিক মূল্যবোধের উৎসস্থল। অবশ্য এটা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হতে পারে। জ্ঞান অর্জন সাপেক্ষ, নাকি জন্মগত– এর পক্ষে বিপক্ষে অনেক আলোচনা হয়েছে। যাহোক, কুরআনে বর্ণিত প্রকৃতি বা ফিতরাত এর অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি কর্তৃক স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ স্বীকৃতি প্রদান যে, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়, তিনি ছাড়া নিরঙ্কুশ আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই। সে সাথে সত্য ও উন্নত নৈতিক মূল্যবোধের প্রশংসা করা এবং অন্যায় ও পাপকে চিনতে পারা। বস্তুতঃ ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, নৈতিক-অনৈতিক বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য কুরআন মজিদ মানুষকে তার সামর্থ বা ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়েছে। সে বিবেচনায় মানব মন জ্ঞানের উৎস ও উপায় দুটোই।

আমরা এখন অন্য একটি দার্শনিক প্রশ্নের দিকে এগোতে পারি। তা হল, বিজ্ঞান ও জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কী? অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত এ বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। এক্ষেত্রে একদল মনে করেন, বিজ্ঞান হলো সে জিনিস যাতে জ্ঞানের পরিপূর্ণতা প্রকাশ পায়, এমন জিনিস যা যুক্তিপূর্ণভাবে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রদর্শন যোগ্য। অন্যদিকে, জ্ঞান হচ্ছে এমন জিনিস যা অর্জন করা হয়, কিন্তু সব সময় প্রমাণযোগ্য নয়। আল কুরআনেও এ ধরনের পার্থক্যের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে এমন অনেক বিষয় আছে যার ব্যাখ্যা তুমি তোমার সীমিত জ্ঞান দিয়ে করতে পারবে না। যার প্রকৃত অর্থ তোমার কাছে বোধগম্য হবে না। এ কারণে আল্লাহ

তোমাকে প্রশ্ন করবেন কীভাবে তুমি তোমার দর্শন, শ্রবণ ও বোধশক্তিকে ব্যবহার করেছ। অর্থাৎ কোন কিছুকে বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করতে হলে তা প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে; এর একটা উৎস থাকতে হবে এবং জানার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে তা অবশ্যই কার্যকর ও যৌক্তিক হতে হবে।

শরীয়তের বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন কিছুর যৌক্তিকতা বুঝতে হলে তা অবশ্যই কুরআন বা সুন্নাহ অথবা ইজমা বা কিয়াসের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে হবে। সে বিবেচনায় শরীয়তও একটি বিজ্ঞান যা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক। এটা বলা বা ধরে নেয়া ঠিক নয় যে, কোন একটা বিশেষ জিনিসের ব্যাপারে বিশেষ উপায় ও শর্তের আলোকে নির্দেশনা প্রদান করাই শরীয়তের কাজ।

আমাদের মূল আলোচনা অর্থাৎ 'জ্ঞানের ইসলামায়ন' বলতে কি বুঝায়- এ প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই যে কথাটি পরিষ্কার করা দরকার তা হল, জ্ঞানের উৎস হচ্ছে ইসলামী উৎস যা কুরআন ও সুন্নাহতে বিদ্যমান এবং প্রকৃতি যা প্রাকৃতিক জগতে বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, এ ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে তা অবশ্যই ইসলামী পদ্ধতি হতে হবে যাতে আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধি ও কৌশল এবং প্রকৃতিগত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এ ফর্মুলায় যে ফলাফল অর্জিত হবে তার সাথে সঙ্গতি থাকবে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের :

ক. মানব প্রকৃতি;

খ. বিশ্ব জগতের প্রাকৃতিক আইন;

গ. ইসলামী শিক্ষা; নীতিমালা ও নিষেধসমূহ;

ঘ. ইসলামী মূল্যবোধ : নৈতিক ও নান্দনিক।

জ্ঞানের ইসলামায়নের প্রয়োজনীয়তা যদি সত্যিই কেউ অনুভব করে তাহলে এর জন্য কিছু না কিছু কাজ করতে হবে। জিহাদের মত সমাজের কেউ যদি এ কাজে এগিয়ে না আসে তাহলে দায়িত্বে অবহেলার জন্য প্রত্যেককেই দায়ী হতে হবে। অনেক পাঠক মনে করতে পারে, এটা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার একটা কৌশল। আমাদের মতে উম্মাহর মধ্যে আজ যে সংকট বিরাজ করছে তার মূলে রয়েছে শিক্ষা প্রদান সংক্রান্ত সংকট। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেসব বিষয় পড়ানো হয় সেখানে সঠিকভাবে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয় না। অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির অভাবই উম্মাহর সংকটের জন্য বহুলাংশে দায়ী। একথা সত্য যে উম্মাহর অধিকাংশ জনগণ অশিক্ষিত এবং শিক্ষার মৌলিক অধিকারটাই এখন নিশ্চিত হচ্ছে না। সেখানে সমস্যার আরেকটি মাত্রা যোগ হচ্ছে এভাবে যে, যারা শিক্ষা পাচ্ছে বা

জ্ঞান অর্জন করছে তারা এমন কারিকুলাম ও পাঠ্যক্রমের আওতায় তা শিখছে যার বিরূপ ও নেতিবাচক প্রভাব থেকে বের হতে পারছে না। সুতরাং একদিকে উম্মাহর এক বিরাট অংশ রয়ে যাচ্ছে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, অপরদিকে, যারা শিক্ষা পাচ্ছে তারা ইসলামী শিক্ষার অভাবে নিজেদের সঠিক পরিচয় ও স্বকীয়তা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামী জ্ঞানের শূন্যতা এ কারণেই। উসমানী খিলাফতের শেষদিন গুলোতে তুরস্কের শিক্ষার অবস্থা জনৈক পশ্চিমা পর্যবেক্ষণের মন্তব্য এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ববাহী। তিনি বলেছেন- *'কোন সমাজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে শিক্ষা যখন তার প্রভাব ও কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ শিক্ষার কোন প্রভাব না থাকলে সে সমাজকে যদি মৃত সমাজ বলা হয় তাহলে ইসলামী সমাজের মৃত্যু বহু আগেই ঘটে গেছে।'*

সুতরাং উম্মাহকে জাগাতে হলে তার শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দর্শনের পরিবর্তে মুসলমানরা নিজেদের আত্মপরিচয়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় শিক্ষা কারিকুলামে। এক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস নিম্নোক্ত দিক নির্দেশনা কিছুটা কাজে লাগতে পারে :

ক. বৈজ্ঞানিক সত্য বলে প্রমাণিত হলে যে কোন জ্ঞানকেই ইসলামী জ্ঞানের আওতাভুক্ত বলে গণ্য করা;

খ. জগত সংসারে ইসলাম মানব জীবনের যে ধারণা ও চিত্র উপস্থাপন করেছে সে চিত্রের আঙ্গিকে সকল জ্ঞানকে দেখা ও বিবেচনা করা। একজন মুসলমান কখনই নিজের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে হারাতে পারে না। আল্লাহর অসীম সৃষ্টি কৌশল ও ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করার পরও অবিশ্বাসীরা তা বুঝতে অক্ষম। এর জন্য আল্লাহ তাদেরকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করেছেন।

গ. ইসলামী নীতিমালার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সবকিছুই প্রত্যাখ্যান করা। এভাবে মুসলিম বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের সাথে মুসলিম সমাজ বিজ্ঞানীগণ পরস্পরের সহায়ক শক্তি ও পরিপূরক হিসেবে কাজ করলে একটা সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যার মাধ্যমে মানুষের এ দুনিয়ায় আগমনের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হতে পারে।

আল্লাহ নিজেই এ বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন এবং এর সর্বোত্তম ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার জন্য পথ নির্দেশ ও বিধান দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর দেয়া বিধানের মধ্যে এমন একটা কথাও পাওয়া যাবে না যা প্রাকৃতিক আইনের সাথে অসংগতিপূর্ণ। শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সামগ্রিক পরিসরে এ সত্যের প্রভাব ব্যাপক। বস্তুতঃ দুনিয়ায় আল্লাহ

আমাদেরকে সামাজিক ও বস্তুগত যত নেয়ামত দান করেছেন তার উদ্দেশ্য হল মানুষ সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ইচ্ছে ও হুকুমের আনুগত্য করবে। উম্মাহর মধ্যে এ ব্যাপারে দায়িত্ববোধ ও চেতনা সৃষ্টি না করা পর্যন্ত তাদের প্রকৃত বধোদয় ঘটবে না এবং উম্মাহ তার লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হবে না।

সুতরাং মুসলিম বিজ্ঞানীকে এক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালন করতে হবে তা একটা দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম। এ কাজে তাড়াহুড়ো করার কোন সুযোগ নেই। এ প্রক্রিয়ার প্রথম কাজ হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করা, তারপর তা আদান-প্রদান করা এবং সবশেষে তা একটা ইসলামী পরিবেশে রূপদান করতঃ যুবশক্তি ও ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা ইসলামী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া।

এ প্রসঙ্গে রাসূলে করিম (ﷺ) এর সে বিখ্যাত হাদীস 'জ্ঞানীর কালী শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র' সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি, এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ যে পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন তা তুলনাহীন। *'কারণ তাহারা থাকিবে আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্তদের সহিত, নবীগণ, সিদ্দীকীন, শহীদগণ ও সালেহীনদের সহিত এবং তাহাদের সঙ্গ কতইনা উত্তম।'*

আল্লাহ আমাদেরকে তাদের মধ্যে গণ্য হওয়ার তৌফিক দিন- আমীন ■

মুসলিম দেশসমূহে বিজ্ঞান গবেষণা

*সাইয়েদ এম আমির**

উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিজ্ঞান

ক্রিশ্চিয়ান সাইন্স মনিটর তাদের সম্প্রতিক এক সংখ্যায় প্রফেসর সালামের (একমাত্র মুসলিম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী) একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। প্রফেসর সালাম কথা প্রসঙ্গে তার সাম্প্রতিক দক্ষিণ কোরিয়া সফরের একটি চমৎকার ঘটনা উল্লেখ করেন। জনৈক টিভি প্রতিবেদকের একটা মন্তব্যে তিনি বিস্মিত হন। নোবেল পুরস্কার পাওয়াকে তারা তখন তাদের জাতীয় লক্ষ্যে পরিণত করেছে বলে উক্ত প্রতিবেদক উল্লেখ করে এবং এ ব্যাপারে প্রফেসর সালাম তাদেরকে কিভাবে সহযোগিতা করতে পারেন তা জিজ্ঞাসা করেন।

ঐ প্রতিবেদকের প্রশ্নের যৌক্তিকতাকে বাদ দিলেও তার প্রশ্ন থেকে যে সত্য বের হয়ে এসেছে তা হলো দক্ষিণ কোরিয়া তাদের বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর কি প্রকার গুরুত্ব প্রদান করছে সে বিষয়টি। বৈজ্ঞানিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের অগ্রসরতাকে তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। অবশ্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়নের নজরকাড়া সাফল্য দেখাতে সক্ষম হয়েছে ভারত ও আর্জেন্টিনা। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে এ ধরনের আশাব্যঞ্জক কোন সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

ফিলাডেলফিয়া ভিত্তিক ইনস্টিটিউট অব সাইন্টিটিক ইনফরশেন এর সাম্প্রতিক গবেষণার একটি চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে। ঐ বছর বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ২৫টি দেশের প্রবন্ধ জরীপে দেখা যায়, এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান সবার শীর্ষে (মোট প্রবন্ধের ৪৩%)। ভারতের অবস্থান ছিল ৮ম এবং ইসরাইল ১৫তম। একটি মুসলিম দেশের নামও স্থান পায় নি ঐ তালিকায়।

শিক্ষা পদ্ধতির প্রভাব

মুসলিম দেশ সমূহে বিজ্ঞানের পশ্চাৎপদতা ও তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকার যেসব ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে সেগুলো সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব। গত শতাব্দীর বেশির ভাগ সময় এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ঔপনিবেশিক শাসনের যাতাকলে পিষ্ট হয়েছে। প্রভু রাষ্ট্রসমূহের উদ্দেশ্য ছিল কেরানী পর্যায়ের কিছু কর্মচারী তৈরি করে তাদের দিয়ে প্রশাসনিক কাজকর্ম চালিয়ে নেয়া। এ লক্ষকে সামনে রেখে তারা ঔপনিবেশিক দেশসমূহে শিক্ষার কারিকুলাম প্রণয়ন করেছিল। বিজ্ঞান

---

* ব্রেইনটি, ম্যাসাচুসেটস, ইউএসএ

শিক্ষার কোন গুরুত্বই স্থান পায় নি তাদের শিক্ষা কারিকুলামে। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানরা নিজেরাও পাশ্চাত্যের যে কোন শিক্ষাকেই ধর্মের পরিপন্থী বলে মনে করেছে। মুসলমানদের এ ধারণা আসলে সঠিক ছিল না এবং এটা ছিল নবী করীম (ﷺ) এর শিক্ষা নীতির পরিপন্থী। কেননা রাসূলে করীম (ﷺ) বলেছেন, *'জ্ঞান অন্বেষণের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাও।'* চীনের কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, সে সময় আরবের প্রেক্ষাপটে চীন ছিল একটি দুর্গম দেশ। আলোচনার অধিকাংশ উদাহরণ আনা হয়েছে ভারত বর্ষে আমার অভিজ্ঞতা থেকে।

বিজ্ঞানের প্রতি বিদ্বেষ ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক সমস্যাও তখন বিদ্যমান ছিল। পাকিস্তানে মুসলমানদের মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আগে থেকেই বিজ্ঞান শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এমনকি এখনও বহু গবেষণাগার রয়েছে যেখানে সরঞ্জামাদির অবস্থা খুবই করুণ, শিক্ষাদান পদ্ধতি সেকেলে, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহৃত উপকরণাদি জরাজীর্ণ ও পুরান। নিম্নমানের শিক্ষাদনের জন্য শিক্ষকদেরকে পুরোপুরি দায়ী করে লাভ নেই। কারণ, আধুনিক বই-পুস্তক ও শিক্ষাদান পদ্ধতির সাথে এসব শিক্ষকদের পরিচয়ের সুযোগ ছিল না বললেই চলে। একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ছাত্র অবস্থায় শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে যদি কোনো বড় ধরনের ঘাটতি ও শূন্যতা থেকে যায় পরবর্তী জীবনে তা পূরণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। যারা দেশে আন্ডার গ্রাজুয়েশন শেষ করে গ্রাজুয়েশনের জন্য বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে তারা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা বলেছে। অনেকে এই ঘাটতি পূরণের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কোর্স সম্পন্ন করেছে। কিন্তু এমন অনেকে আছে যারা কখনই এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। নিম্নমানের শিক্ষাই একমাত্র সমস্যা নয়। মুক্ত চিন্তার সামর্থ্য, প্রতিষ্ঠিত কোন তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা এবং নতুন কিছু উদ্ভাবন করা যা মৌলিক গবেষণা কাজের জন্য অপরিহার্য ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের শিক্ষার্থীরা স্কুল-কলেজে শিখতে পারছে না। ফলে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রী নিয়ে বের হয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের পেশাগত জীবনে উদ্ভাবনীমূলক দিক নির্দেশনা প্রদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্থ থাকছে।

অবশ্য ইদানিং এ স্থবিরতা কেটে যাওয়ার একটা সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি করাচীর আগাখান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব রসায়ন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক লেকচার সেশনে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমার দেখে ভাল লাগল যে, ছাত্ররা নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করছে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে। শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মানের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে। পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন রয়েছে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর পদচারণা, বিশাল ক্যাম্পাস ও বিভিন্ন বিভাগ ও ফ্যাকাল্টি। এতদসত্ত্বেও গত বছর বড় মাপের বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে যেয়ে বৃত্তিমূলক ও গবেষণাকর্মে শিক্ষার্থীদের তেমন কোনো

আগ্রহ নজরে পড়েনি। বরং বিকাল না হতেই দেখা গেল ক্যাম্পাস ফাকা হয়ে গেছে এবং ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞান চর্চার চেয়ে রাজনীতি ও আঞ্চলিক সমস্যা নিয়ে বেশি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে। ছাত্রদের মাঝে জ্ঞান অন্বেষণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের অভাব ও অনিহার পাশাপাশি আরো বেশি পীড়াদায়ক ব্যাপার হল এসব ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নির্লিপ্ততা। কারণ জ্ঞানের প্রদীপ যারা জ্বালবে সেই ফ্যাকাল্টি সদস্যরাই যদি গবেষণা কর্মে নিয়োজিত না থাকে তাহলে তরুণ প্রজন্ম তাদের কাছ থেকে কি প্রেষণা লাভ করবে? গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োগ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করবে না। সুতরাং গবেষণা কর্মের অনুপস্থিতি মানেই গুণগত শিক্ষাদানের অবসান। যিনি যে বিষয় পড়ান সে বিষয়ের সর্বশেষ তথ্য ও অগ্রগতি সম্পর্কে যদি তিনি ওয়াকেফহাল ও তথ্যসমৃদ্ধ না হন তাহলে তার ছাত্রদেরকে কী শিখাবেন?

গবেষণা সহায়তার কৌশল

গবেষণার কাজে তাড়াহুড়া না করে বরং যুক্তরাষ্ট্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে সেগুলো যাচাই করে তার সাথে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে প্রচলিত ব্যবস্থার একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ সহায়তা আসে ফেডারেল গভর্নমেন্টের তহবিল থেকে। অর্থ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে রয়েছে বিরাট প্রতিযোগিতা। এ ধরনের অর্থ মঞ্জুরীর উপর নির্ভরশীল বিপুল সংখ্যক গবেষণাকর্মী একটা স্থায়ী অনিশ্চয়তায় ভোগে এই ভেবে যে, ভবিষ্যত অর্থ বরাদ্দের ধারাবাহিকতা বহাল থাকবে কিনা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা এখন অন্যরকম। তারা উল্টো ফ্যাকাল্টিগুলোকেই গবেষণা তহবিল সৃষ্টির অনুরোধ জানায় যাতে তাদের বেতনের খরচটা অন্তত মিটানো যায়।

অনেকের মতে যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা সহায়তা ব্যবস্থা এখন বড়ই নির্মম। তারা এসব ক্ষেত্রে এখন অনৈতিকতার আশ্রয় নিয়ে থাকে। অসৎ গবেষকদেরকে ভুয়া তথ্য দিয়ে লেখা প্রকাশ করার জন্য উৎসাহিত করে থাকে। দ্রুত ফল লাভের আশায় সময় সাপেক্ষ গবেষণাধর্মী কাজকে তারা নিরুৎসাহিত করে থাকে। বিবেকবান বিজ্ঞানীদেরকে সার্বক্ষণিক চাপ ও ব্যস্ত রাখার মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করতে চায় দাতারা।

যুক্তরাষ্ট্রের এরূপ মনোভাব ও পন্থাকে কার্যকর মনে করে একে একটা মডেল হিসেবে অন্যত্র চালান দেয়ার নীতি গ্রহণযোগ্য নয়। এর অপেক্ষাকৃত উত্তম বিকল্প হিসেবে ইউরোপীয় ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা যেতে পারে। ইউরোপীয় ব্যবস্থা কিছুটা সহজ প্রকৃতির এবং আমাদের পরিবেশ ও ঐতিহ্যের কাছাকাছি। ইউরোপীয় ব্যবস্থায় বেশির ভাগ নিয়োগ স্থায়ী প্রকৃতির। তবে একজন শিক্ষক বা গবেষকের পরবর্তী ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করে তার ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতার উপর।

বর্তমানে আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় বা ইউরোপীয় কোন পদ্ধতিই অনুসরণ করছি না। পাকিস্তানের কথাই ধরা যাক, এখানে অধিকাংশ নিয়োগ স্থায়ী প্রকৃতির। ফলে চাকুরির নিরাপত্তা আছে। ফ্যাকাল্টি কর্মকাণ্ডের উপর কোন জবাবদিহিতার তেমন ব্যবস্থা নেই। এখানে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার প্রয়োজন হয় না এবং চাকুরির নিরাপত্তার বিষয়টা যথেষ্ট নিশ্চিত। তাই চাকরির ব্যাপারে একটা আত্মতৃপ্তির অবস্থা সেখানে বিরাজমান। এরকম একটা ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, পদোন্নতির জন্য গবেষণা কর্ম বা শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন অবদান আছে কিনা সে সবের মূল্যায়ন বড় কথা নয়, বরং জ্যেষ্ঠতার লাইনে দাঁড়াতে পারলেই পদোন্নতি নিশ্চিত।

সরকারের ভূমিকা

এতক্ষণ যে আলোচনা হল তাতে মনে হচ্ছে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে যে দুর্গতি বিরাজ করছে তার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই দায়ী এবং তারা ইচ্ছে করলেই পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম। বিষয়টি আসলে তা নয়। যে কোন দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহায়তা একটা বড় ব্যাপার। বিজ্ঞান বিষয়ক নীতিমালা গ্রহণ ও তার ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আয়ত্বের বাইরে। অন্যদিকে গবেষণা ক্ষেত্রে বেসরকারী সেক্টরগুলোরও বড় ধরনের কোন আর্থিক সহায়তা প্রদানের সামর্থ নেই। ফলে মুসলিম দেশগুলোতে সরকারের ভূমিকা এবং পাশাপাশি বিজ্ঞানের অবস্থা বিশেষভাবে সংকটাপন্ন।

আমাদের দেশগুলোতে কম বেশি স্বৈরশাসকরাই অধিকাংশ সময় শাসন করেছে। আর এসব শাসকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন অপেক্ষা নিজেদের গদি রক্ষার দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়েছে। অর্থ সম্পদের একটা বিরাট অংশ ব্যয় হয়েছে সামারিক স্থাপনার জন্য, আর যৎসামান্য বরাদ্দ এসেছে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের জন্য। বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য যতটুকু বরাদ্দ পাওয়া গেছে তাও আবার পরিকল্পিত উপায় ও সঠিকভাবে ব্যয় করা হয়নি। কয়েক বছর পুর্বে পাকিস্তানের কাউন্সিল অব রিসার্চ এর একজন কর্মচারী মন্তব্য করেন যে, সংগঠনটির বাজেটের ৮০% ব্যয় হয় শুধুমাত্র কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধে। বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি কেনার পয়সা কমই থাকে। ফলে মাস শেষে বেতনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কর্মচারীদের তেমন কিছুই কাজ থাকে না।

কিভাবে আমরা উন্নতি করতে পারি

মরোক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া- ভূ-মণ্ডলের এক বিশাল এলাকা নিয়ে ছড়িয়ে আছে মুসলিম দেশ সমূহ। প্রতিটি দেশেরই রয়েছে নিজস্ব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ। এগুলোর উপর ভিত্তি করে স্ব স্ব দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণীত হয়ে থাকে। স্থান-কাল-পাত্রের এ বৈচিত্রের কারণে প্রত্যেক দেশকে নিজস্ব আঙ্গিকে সমস্যা সমাধানের উপায় বের করতে হয়। তবুও সকলের জন্য সাধারণ কিছু বিষয় চিন্তা করা যেতে পারে যার একটা ধারণা নিচে দেয়া হলো–

অধিকাংশ মুসলিম দেশের সমকালীন বিজ্ঞানের অগ্রগতির অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কোন দেশই উল্লেখ করার মত কোন অবস্থানে পৌছতে পারেনি। এক্ষেত্রে মেডিকেল গবেষণার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। অগ্রসর দেশগুলোর সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের পর্যায়ে এখনো পৌছানো সম্ভব হয়নি। তাই এ মুহূর্তে মুসলিম দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করা যেতে পারে এবং গবেষকদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি শিক্ষাদানের লক্ষ্যে মাঝে মাঝে ওয়ার্কশপের আয়োজন করা যেতে পারে। সম্প্রতি পাকিস্তান সরকার একটা কর্মসূচী হাতে নিয়েছে যেখানে বিদেশে কর্মরত দেশের বিজ্ঞানীদেরকে ডেকে আনা হচ্ছে স্থানীয় বিজ্ঞানীদেরকে নতুন নতুন কৌশল শিক্ষা দানের জন্য। এর সুফল অনেক, অন্যরাও এটা অনুসরণ করতে পারে।

পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদেরকে এনে সেমিনার বা আলোচনা সভার আয়োজন করে দেশীয় বিজ্ঞানের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এতে পর্যটন শিল্পের হয়ত কিছু উন্নতি হতে পারে। এ ধরনের সেমিনারে স্থানীয় বিজ্ঞানীদের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান থাকে না এবং বিদেশীরা যা উপস্থাপন করে তার সাথে স্থানীয় বিজ্ঞানীদের চিন্তার সম্পৃক্ততা থাকে না।

কিছু সময়ের জন্য ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার মত তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমুহের বিজ্ঞানীদেরকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। এতে তাদের সাথে আমাদের বিজ্ঞানীদের জ্ঞান ও ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তারা একটা সুস্থ্য প্রতিযোগিতায় আত্মনিয়োগ করতে পারবে।

পাকিস্তানের কিছু কিছু গবেষণাগার সরঞ্জামাদীর গোরস্থানে পরিণত হয়েছে। এগুলোর খুচরা যন্ত্রাংশ যেমন পাওয়া যায় না তেমনি এগুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণও হয় না। ফলে স্তুপিকৃতভাবে পড়ে থাকা ছাড়া এগুলোর কোনো গত্যন্তর নেই। কিছু কিছু মুসলিম দেশের চাহিদা ও সম্পদকে যদি পরিকল্পিতভাবে সংগ্রহ করা যেত তাহলে এগুলো দিয়ে ঐসব সরঞ্জামাদী সংরক্ষণ ও মেরামত করা সম্ভব হত। এমনকি আন্ত-র্জাতিক কোম্পানীগুলোও এক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহী হত।

বর্তমানে রোগ নির্ণয় পরীক্ষার জন্য রেডিও আইসোটোপ এবং রেডিও ইমিউনোসারি যন্ত্রপাতি জাপান ও ইউরোপ থেকে আমদানী করতে হয়। এতে সময় ও অর্থ উভয় ব্যয় হয়। কোন একটি একক মুসলিম রাষ্ট্র নিজের উৎপন্ন দ্রব্য বাজারজাত করার মত উপযুক্ত বাজার সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। তাই চাহিদা জোগাড় করা গেলে তার উপর ভিত্তি করে স্থানীয় উৎপাদন শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হত। সকল বায়ো-মেডিকেল গবেষণার জন্য মৌলিক বিজ্ঞানী ও হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের মধ্যে একটা

নিবিড় সহযোগিতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। চিকিৎসকদের বেশির ভাগেরই মেডিকেল ছাত্র হিসাবে গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োগ করার তেমন কোন সুযোগ নেই বললেই চলে এবং রোগের এপিডোমাইওলজি ও প্যাথফিজিওলজির উপর পড়াশুনা করার মত যথেষ্ট প্রশিক্ষণ নেই। অথচ এসব রোগ সেসব দেশে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, করাচীতে ডায়াবেটিস বা কার্ডিওভাসকুলার রোগের উপর উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণার অগ্রগতির কথা শোনা যায় না। কিন্তু সেখানে এ দুটি রোগের প্রাদুর্ভাব ব্যাপক।

আমাদের শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহে গ্রন্থাগার সুযোগ এতটাই সীমিত যে, সংশ্লিষ্ট গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের পক্ষে সর্বশেষ গবেষণা সংক্রান্ত অগ্রগতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকাও সম্ভব নয়। কারিগরি সাময়িকী ও বই-পুস্তক খুব ব্যয় বহুল এবং গ্রন্থাগার সমূহের আর্থিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা কখনও অগ্রাধিকার তালিকায় স্থান পায় না। গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে নিবিড় সহযোগিতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করার জন্য উচ্চ মানের সাময়িকী প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হবে কিনা এ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। আমার মতে এ ধরনের সাময়িকী প্রকাশের বিষয়টি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়, অন্তত এ পর্যায়ে। এ মুহূর্তে প্রয়োজন গবেষণা কর্মে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান যেমন তা করা হয়ে থাকে পাশ্চাত্য সাময়িকীগুলোর ক্ষেত্রে।

সকল বিশ্ববিদ্যালয় এক একটি গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠবে এমনটা প্রত্যাশা করা বাস্তবসম্মত নয়। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় জোর দেবে শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রতি এবং কিছু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দিষ্ট করতে হবে গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে। গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যথাসাধ্য সার্বিক সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং মেধাবী গবেষকদের জন্য সেখানে সুযোগ করে দিতে হবে। গবেষণা কর্মে জবাবদিহিতার ব্যবস্থাও থাকতে হবে এবং যারা দীর্ঘদিন কাজ করার পরও উল্লেখযোগ্য কিছু উপহার দিতে সক্ষম হবে না তাদেরকে বিকল্প পেশা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া যাবে।

গবেষণাগারগুলো একবার উৎপাদনমুখী হয়ে গেলে পরবর্তীতে তার যাত্রা অব্যাহত থাকবে। বিজ্ঞানীদের অধ্যবসায় এবং সরকারের সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস মুসলিম দেশগুলোতে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। সেদিন বেশি দূরে নয় যখন বিজ্ঞানের কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারব যেমনটি আমাদের পূর্বপুরুষেরা পেরেছে ■

বিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রশাসনে ইসলামী মূল্যবোধ সংযোজন

*এস এইচ দুররানী**

গত ৪০ বছরে অনেক মুসলিম রাষ্ট্র আধুনিক গবেষণা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের পেছনে বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় ও জনবল নিয়োগ করা সত্ত্বেও ফলাফল খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনে এবং গবেষণা কর্মকাণ্ডে ইসলামী মূল্যবোধের অভাবই কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ না হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ বলে ধরে নেয়া যায়।

একটা বিজ্ঞান গবেষণা সেন্টারের প্রশাসন সে প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের উপর বিরাট প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ প্রতিষ্ঠানে কি ধরনের লোক নিয়োগ করা হবে, কি কি প্রকল্প হাতে নেয়া হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা থাকে প্রশাসনের হাতে। প্রশাসনের মন-মানসিকতায় যদি ইসলাম থাকে তাহলে তারা তাদের এ ক্ষমতা একটা আমানত বলে মনে করবে, যোগ্য ব্যক্তিদেরকে যথাস্থানে নিয়োগ করবে এবং প্রতিটা প্রকল্পে প্রয়োজনীয় তহবিল ও উপকরণ যোগান দেবে। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখি? এখন প্রশাসন মানেই যেন স্বজন-প্রীতি, ব্যাক্তিত্বের সংঘাত, আঞ্চলিকতা, কুসংস্কার। ফলে শুরুতেই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়, প্রতিষ্ঠান গড়ার মূল লক্ষ্য সুদূর পরাহত থেকে যায়।

এ ধরনের একটা প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে প্রধানতঃ তার কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা প্রশাসন যন্ত্রের গুণগত মানের উপর। প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা এবং যন্ত্রপাতি যত মূল্যবান ও চটকদারই হোক না কেন, প্রশাসনে যদি যথার্থ লোক বসানো না যায় তবে সবই বৃথা হতে বাধ্য। সেন্টার বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডকে পেশাগত অঙ্গীকারে রূপদান করতে হবে। কর্মচারীদের মধ্যে একটা মিশনারী দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে হবে এবং ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটা সাধারণ লক্ষে কাজ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা, কোরবানী করার মানসিকতা এবং সৎ কর্মের মাধ্যমে সৎ উপার্জনের চিন্তা। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কর্মচারীদের মধ্যে কাজের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শনের চেয়ে নিজেদের মর্যাদা ও বেতন-ভাতা নিয়ে অধিকতর ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। গবেষণা কাজের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা তাদের প্রধান দায়িত্ব সেদিকে মনোযোগ কমই থাকে। সুতরাং ফলাফল যা হবার তা হয়– হতাশা ও স্থবিরতা।

---

* নাসা গোডাড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার গ্রিনবেল্ট, ম্যারিল্যান্ড ইউএসএ

প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ের লোকদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ সঞ্চার করা গেলে এ অবস্থার উন্নতি আশা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তির নির্বাচন বা নিয়োগের ক্ষেত্রে তার পাণ্ডিত্য বা প্রশাসক হিসেবে তিনি কত যোগ্য শুধু তা দেখলেই হবে না, তার ব্যক্তিগত চরিত্রের মূল্যায়নও এ ক্ষেত্রে আবশ্যক। তার ব্যক্তিত্ব ও পরিপক্কতা এমন হবে যাতে অধীনস্ত কর্মচারীগণ তার মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তা খুঁজে পায়। তিনি কর্মচারীদের কাছ থেকে অন্ধ আনুগত্য ও 'ইয়েস ম্যানসিপ' এর পরিবর্তে তাদের যোগ্যতাকে অগ্রাধিকার দিবেন। তরুণ কর্মচারীদেরকে কাজে উদ্যোগী ও উদ্যোমী হবার জন্য উৎসাহ দিবেন এবং তাদেরকে অধীনস্থ কর্মচারী না ভেবে সহকর্মী হিসেবে বিবেচনা করে সেভাবে তাদের সাথে আচরণ করবেন। এ রকম একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে প্রতিষ্ঠান ও এর কর্মীগোষ্ঠীর কাছে ভাল ও সৃষ্টিধর্মী কর্ম আশা করা যায় এবং প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। একইভাবে কর্মচারী নিয়োগ করার সময় তাদের ইসলামী মূল্যবোধের বিষয়টি দেখতে হবে। তাদের লক্ষ্য হবে জ্ঞানের সমৃদ্ধি, ব্যক্তি উন্নতি নয়। তাদের মধ্যে এ অনুভূতি জাগায়ে তুলতে হবে যে বিজ্ঞানের জন্য কাজ করার মাধ্যমে মানবতা ও উম্মাহর যে খেদমত হবে এবং তার জন্য যে প্রতিদান রয়েছে সে তুলনায় দুনিয়ার সাময়িক ধন-সম্পদ ও আরাম-আয়েশ তুচ্ছ।

উপরের আলোচনায় যে ধারণা পাওয়া গেল তা ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও বাস্তবায়নের কথা চিন্তা করতে হবে। সারা পৃথিবীর দু-একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত এরূপ ২/১টি কর্মসূচী চালু করা প্রয়োজন। মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন এরূপ কোন রাষ্ট্রে আলোচ্য প্রকল্পের সফলতার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে হয়। কারণ সেখানে তুলনামূলকভাবে উপরে বর্ণিত সামাজিক সমস্যা কম ■

যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম ছাত্রদের অবস্থা : সংখ্যা ও পরিচিতি

ঈসাম ইসমাইল *

সারসংক্ষেপ

এ আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে অধ্যয়নরত আন্তর্জাতিক ছাত্রদের একটি চিত্র দেখানো হয়েছে। উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আদান-প্রদান সংক্রান্ত তথ্যের একটা সারাংশও এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত মোট আন্তর্জাতিক ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ৩০%। ভৌগলিকভাবে তাদের মূল অবস্থান, শিক্ষাগত ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিও এ আলোচনায় সন্নিবেশিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল এবং পাবলিক ও প্রাইভেট কলেজসমূহে তাদের সংখ্যা, দুই অথবা চার বছর মেয়াদী কোর্স সম্পন্ন কলেজসমূহে ভর্তির অনুপাত এবং জীবন যাত্রার ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন ভিন্ন একটি গবেষণা পত্রে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক ছাত্রদের শিক্ষা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি এবং নতুন পরিবেশে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরিচিতিমূলক কর্মসূচীর আয়োজন করে থাকে। এ ধরনের কর্মসূচীর নিয়মিত বা সাধারণ বিষয়সমূহ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। মুসলিম আন্তর্জাতিক ছাত্রদের ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলোর অভাব পরিলক্ষিত হয় সে সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা দেয়া হয়েছে এবং কিভাবে এ অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব তার একটা পরামর্শও দেয়া হয়েছে।

১. যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক ছাত্র সংখ্যা

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত আন্তর্জাতিক ছাত্রদের একটা সমীক্ষা প্রকাশ করা হয়ে থাকে (১৯৪৯ সাল থেকে)। সমীক্ষা থেকে দেখা যায় সত্তর দশকের শেষাংশে আন্তর্জাতিক ছাত্র সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল যার গড় বৃদ্ধি ছিল ৭৩.৯%। এসব প্রতিবেদনের শুমারীতে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক ছাত্র ভর্তির সূচক সবচেয়ে উর্ধমূখী ছিল ১৯৮১ শিক্ষা বর্ষের শুরুতে। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৩১,০০০ (একত্রিশ) হাজারে। ১নং চিত্রে দেখা যায় সত্তর দশকের ২য় অর্ধেকে রেকর্ডকৃত ছাত্র বৃদ্ধির হার ১৯৮১ পর্যন্ত চলমান থাকে। ১৯৫৪/৫৫ সাল থেকে ১৯৮৪/৮৫ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ছাত্র ভর্তি ও ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটা ডাটা ১নং চিত্রে দেখানো হয়েছে–

* এডুকেশন এন্ড ক্যারিয়ার ইনফরমেশন ব্যুরো, প্লেইন ফিল্ড, ইন্ডিয়ানা, ইউএসএ

স্মারণি ১ : ১৯৫৪/৫৫ সাল থেকে ১৯৮৪/৮৫ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ছাত্র ভর্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ :
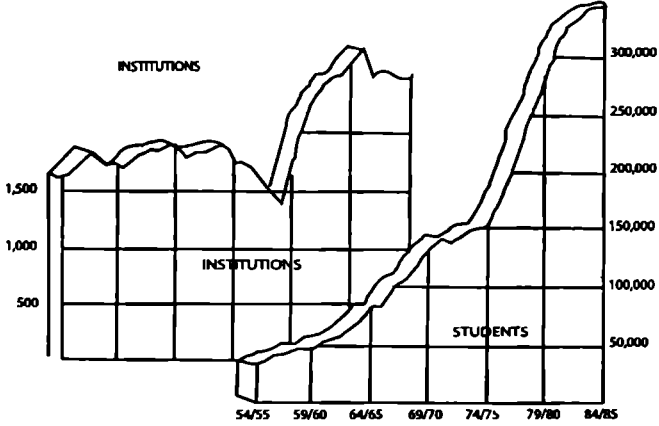
১৯৮১ সনে পৃথিবীর ১৩৭টি দেশে ৯১২,৩৭৭ জন আন্তর্জাতিক ছাত্র লেখাপড়া করেছে। আর শুধু যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে বছর পড়াশুনা করেছে ৩২৬,২৯৯ জন আন্তর্জাতিক ছাত্র যা মোট সংখ্যার ৩৬%। টেবিল ২ এ ১৯৮১ সনে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক ছাত্র ভর্তির একটা চিত্র দেখানো হয়েছে। ঐ একই বছরে সংশ্লিষ্ট দেশের মোট ছাত্র ভর্তি ও আন্তর্জাতিক ছাত্র ভর্তির একটা পরিসংখ্যানগত ডাটাও দেয়া হয়েছে। এতে দেখা যায়, ফ্রান্স দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক ছাত্র ভর্তিকারী দেশ এবং ফ্রান্সের তিনগুণ বেশি আন্তর্জাতিক ছাত্র ভর্তি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্তরাষ্ট্রের এ সংখ্যা ৩২৬,২৯৯ জন এবং ফ্রান্সে ১০৮,৬০৭ জন।

ক. যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম ছাত্র

১৯৮৪/৮৫ সালে ভর্তিকৃত ৩৪২,১১০ জন আন্তর্জাতিক ছাত্রের মধ্যে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ার ছাত্র সংখ্যা ছিল ১০১,৬৫৯ জন যা যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ভর্তির ৩০%। এসব অঞ্চলের মুসলিম আন্তর্জাতিক ছাত্রদের একটা বিবরণ দেখানো হলো ৩নং টেবিলে। এতে দেখা যায় ১৯৮৪/৮৫ সালের মুসলিম আন্তর্জাতিক ছাত্রদের মধ্যে মধ্য প্রাচ্যের ছাত্র সংখ্যা সর্বোচ্চ যার শতকরা হার ১৪.১৬ জন। এর পরের স্থানে রয়েছে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া (৩৪, ১১৫) যার শতকরা হার ১১.১৩। আফ্রিকার দেশসমূহ থেকে গিয়েছিল ১৫,১২৩ জন যার শতকরা হার

টেবিল ১ : বিদেশী ছাত্র ও প্রতিষ্ঠানসমূহ (১৯৫৪/৫৫ - ১৯৮৩/৮৪)

বছর	বিদেশী ছাত্র	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বছর	বিদেশী ছাত্র	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
১৯৫৪/৫৫	৩৪২৩২	১৬২৯	১৯৬৯/৭০	১৩৪৯৫৯	১৭৩৪
১৯৫৫/৫৬	৩৬৪৯৪	১৬৩০	১৯৭০/৭১	১৪৪৭০৮	১৭৪৮
১৯৫৬/৫৭	৪০৬৬৬	১৭৩৪	১৯৭১/৭২	১৪০১২৬	১৬৫০
১৯৫৭/৫৮	৪৩৯৯১	১৮০৪	১৯৭২/৭৩	১৪৬০৯৭	১৫০৮
১৯৫৮/৫৯	৪৭২৪৫	১৬৮০	১৯৭৩/৭৪	১৫১০৬৬	১৩৫৯
১৯৫৯/৬০	৪৮৪৮৬	১৭১২	১৯৭৪/৭৫	১৫৪৫৮০	১৭৬০
১৯৬০/৬১	৫৩১০৭	১৬৬৬	১৯৭৫/৭৬	১৭৯৩৪৪	২০৯৩
১৯৬১/৬২	৫৮০৪৬	১৭৯৮	১৯৭৬/৭৭	২০৩০৬৮	২২৯৪
১৯৬২/৬৩	৬৪৭০৫	১৮০৫	১৯৭৭/৭৮	২৩৫৫০৯	২৪৭৫
১৯৬৩/৬৪	৭৪৮১৪	১৮০৫	১৯৭৮/৭৯	২৬৩৯৩৮	২৫০৪
১৯৬৪/৬৫	৮২০৪৫	১৮৫৯	১৯৭৯/৮০	২৮৬৩৪৩	২৬৫১
১৯৬৫/৬৬	৮২৭০৯	১৭৫৫	১৯৮০/৮১	৩১১৮৮২	২৭৩৪
১৯৬৬/৬৭	১০০২৬২	১৭৯৭	১৯৮১/৮২	৩২৬২৯৯	২৪৫৪
১৯৬৭/৬৮	১১০৩১৫	১৮২৭	১৯৮২/৮৩	৩৩৬৯৮৫	২৫২৯
১৯৬৮/৬৯	১২১৩৬২	১৮৪৬	১৯৮৩/৮৪	৩৩৮৪৯৪	২৪৯৮

টেবিল ২ : শীর্ষস্থানীয় স্বাগতিক দেশসমূহে বিদেশী ছাত্র ও মোট ছাত্র (১৯৮১)

স্বাগতিক দেশ	বিদেশী ছাত্র ভর্তি	মোট ছাত্র ভর্তি	মোট ভর্তির শতকরা হার	স্বাগতিক দেশ	বিদেশী ছাত্র ভর্তি	মোট ছাত্র ভর্তি	মোট ভর্তির শতকরা হার
যুক্তরাষ্ট্র	৩২৬২৯৯	১২৩৭১৬৭২	২.৬	সুইডেন	১৩১৮২	১৯৮৭৯৮	৬.৬
ফ্রান্স	১০৮৬০৭	১০৭৬৭১৭	১০.১	অস্ট্রিয়া	১২৮৮৫	১৪০৭২০	৯.২
জার্মানী (এফআর)	৬৭২১৬	১৩২৫১৭৯	৫.১	ব্রাজিল	১২৮০০	১৪০৯২৪৩	০.৯
				বেলজিয়াম	১২২৬০	২১৩২৮১	৫.৭
ইউএসএসআর	৬২৯৪২	৬১৪৬৪৯১	১.০	স্পেন	১০৯৯৭	৭০৪৩১০	১.৬
ইউ কে	৫০৬৮৪	৮৫৮৪১৬	৫.৯	অস্ট্রেলিয়া	১০৯২১	৩৩৪০৩০	৩.৩
কানাডা	৩২৩০৩	৯২৪৪৪৫	৩.৫	গ্রীস	৮৩০৪	১১৭৪০৭	৭.১
ইতালী	২৭৭৮৪	১১১৭৭৪২	২.৫	ভ্যাটিক্যান সিটি	৭৪১৭	৭৪১৭	১০০.০
লেবানন	২৬৩৪৩	৭০৩১৪	৩৭.৯	জার্মান ডিসি	৭৪১১	৪০৪৬১৮	১.৮
রোমানিয়া	১৬৯৬২	১৯০৯০৩	৮.৯	জাপান	৭১৮২	২৪০২৭২৫	০.৩
সৌদি আরব	১৬৪৬৯	৭০৬৫৭	২৩.৩	তুরস্ক	৬৩৭৮	২৪০৬৮০	২.৬
মিশর	১৬২৯৭	৫৬৭১২৮	২.৯	ইরাক	৫৫৮০	২৪০৬৮০	৬.৫
সুইজারল্যান্ড	১৫৫১৫	৮৮৩৮৫	১৭.৬	ফিলিপাইন	৫০৯১	১৩৩৫৮৮৯	০.৪
ভারত	১৪৭১০	৫৩৪৫৫৮০	০৩				

৪.৪২। সবচেয়ে বেশি মুসলিম ছাত্র পাঠিয়েছিল মালয়েশিয়া (২১,৭২০), এরপর ইরান (১৬,৬৪০) এবং এ গ্রুপে সবচেয়ে কম ছাত্র পাঠায় ব্রুনাই (৩০)। আন্তর্জাতিকভাবে এসব অঞ্চল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি ছাত্র প্রেরণকারী দেশ তাইওয়ান এবং দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মালয়েশিয়া।

খ. ওপেক জাতিসমূহ থেকে মুসলমান ছাত্র

১৩টি ওপেক জাতির মধ্যে ১০টি দেশ যুক্তরাষ্ট্রে ছাত্র প্রেরণ করে। ১৯৮৪/৮৫ সনে ওপেক দেশসমূহ হতে প্রেরিত মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৪৯,৮১৩ যা আন্তর্জাতিক মুসলিম ছাত্রের শতকরা ৫১.৬৩ ভাগ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মোট ছাত্রের ১৪.৫৬% ভাগ।

২. শিক্ষা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য

ক. শিক্ষাগত পর্যায়

১৯৮৪/৮৫ এর শিক্ষা শুমারী প্রকাশিত না হওয়ায় ১৯৮৪/৮৫ সনের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো যাতে মাত্র ১০টি মুসলিম দেশের তথ্য দেখানো হয়েছে। টেবিল ৪ এ এটা দেখানো হল। ১৯৮৪/৮৫ সনে ভর্তিকৃত মোট ১০১,৩৭৪ জনের মধ্যে মুসলিম আন্ত র্জাতিক ছাত্রের সংখ্যা ৭৬, ০৫১।

এ সকল দেশ থেকে আসা গ্রাজুয়েট ও আন্ডার গ্রাজুয়েট মুসলিম ছাত্রের সংখ্যাগত পার্থক্য অনেক বেশি। আন্ডার গ্রাজুয়েট পর্যায়ে মিশর ও ভারত সীমিত সংখ্যক ছাত্র পাঠিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আন্ডার গ্রাজুয়েট পর্যায়ে অন্যান্য দেশ ৬০% এর বেশী ছাত্র পাঠিয়ে থাকে যার গড় হার প্রায় ৭১%। আন্ডার গ্রাজুয়েট পর্যায়ে ছাত্র প্রেরণের ক্ষেত্রে এ ১০টি দেশের মধ্যে মালয়েশিয়ার অবস্থান শীর্ষে (১৪,৭৭৪)। অন্যদিকে গ্রাজুয়েট ছাত্র প্রেরণের ক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইরান সবার শীর্ষে। সবচেয়ে কম সংখ্যক ছাত্র আসে ভারত থেকে।

টেবিল ৩ : মুসলিম আন্তর্জাতিক ছাত্রদের দেশ পরিচিতি (১৯৮৩/১৯৮৪ এবং ১৯৮৪/১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দ)

আফ্রিকা			মধ্যপ্রাচ্য		
	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫		১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫
উত্তর আফ্রিকা					
মিশর	২৩৪০	২৪১০	ইরান	২০৩৬০	১৬৬৪০
লিবিয়া	১৭১০	১২০০	সৌদি আরব	৮৬৩০	৭৭৬০
আলজেরিয়া	৭৮০	৭৮০	লেবানন	৩৩৪০	৩৪৭০
মরক্কো	৭০০	৭৭০	(৫০%)*	৬৮৯০	৬৭৫০
সুদান	৭৩০	৬৯০	জর্ডান	৩৮১০	৩৯৮০
তিউনিসিয়া	৫৮	৬৪০	কুয়েত	২৮৩০	২৬৪০
উত্তর আফ্রিকা মোট	৬৩১৮	৬৪৯০	তুরস্ক	১৯৪০	২১৮০
			সিরিয়া	১৭৩০	১৫৫০
	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫	ইরাক	১২৬০	১২৭০
পশ্চিম আফ্রিকা	৯৪৩৭	৮৬৩৩	ইউএই	৭৮০	৮১০
নাইজেরিয়া			কাতার	৪৮০	৫৪১
(৪৭%)*			ইয়েমেন	৩৯০	৪৩০
আফ্রিকা সর্বমোট	১৫৭৫৫	১৫১২৩	বাহরাইন	৩৬০	৪০০
			ওমান		
			মধ্যপ্রাচ্য সর্বমোট	৫২৮০০	৪৮৪২১

দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া

দক্ষিণ মধ্য			দক্ষিণ পূর্ব		
এশিয়া	১৩৭৪	১৫৬৪	এশিয়া	১৮১৫০	২১৭২০
ভারত	৪২৮০	৪৭৫০	মালয়েশিয়া	৬১১০	৭১৯০
(১০.৭%)	২১৫০	২০১০	ইন্দোনেশিয়া	৪৮৪	৫৬২
পাকিস্তান	১০০	১১৮	সিঙ্গাপুর	৩০	৩০
বাংলাদেশ	১৪১	১৪১	(১৫%)*		
শ্রীলঙ্কা			ব্রুনাই	২৪৭৭৪	২৯৫০২
আফগানিস্তান	৮০৪৫	৮৫৮৩	দক্ষিণ পূর্ব		
দক্ষিণ মধ্য			এশিয়া		
এশিয়া মোট			সর্বমোট		
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া সর্বমোট				৩২৮১৯	৩৮০৮৫

১৯৮৩/৮৪ সালে ইউএসএ তে সর্বমোট মুসলিম ছাত্র ১,০১,৩৭৪
১৯৮৪/৮৫ সালে ইউএসএ তে সর্বমোট মুসলিম ছাত্র ১,০১,৬৫৯

* সূত্র ৪ও ৫। গণনার ক্ষেত্রে দু'টি সূত্রের নিম্নতর শতকরা হার ধরা হয়েছে

টেবিল ৪ : অঞ্চলভিত্তিক মুসলিম আন্তর্জাতিক ছাত্রদের শিক্ষাগত অবস্থা (১৯৮৩/৮৪ খ্রীঃ)

শিক্ষাগত অবস্থা (ছাত্র সংখ্যা)

দেশ	আন্ডার গ্রাজুয়েট	গ্রাজুয়েট	অন্যান্য	মোট
আফ্রিকা				
নাইজেরিয়া	৬৮১৪	২৫১০	১১৩	৯৪৩৭
মিশর	৫৮৩	১৬২৯	১২৮	২৩৪০
লিবিয়া	১০৪৫	৬২৪	৪১	১৭১০
মধ্যপ্রাচ্য	১২৯৬৯	৬৯০২	৪৮৯	২০৩৬০
সৌদি আরব	৫৭২২	১৯৭৬	৯৩২	৮৬৩০
জর্ডান	৫৩৮৮	১১৬৪	৩৩৮	৬৮৯০
লেবানন	২৫৫৫	৬৪৮	১৩৭	৩৩৪০
কুয়েত	২৮৭৭	৬৯০	২৩৬	৩৮০৩
দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া				
মালয়েশিয়া	১৪৭৭৪	২৯০৪	৪৭২	১৮১৫০
ভারত	৩১৫	১০২৫	৪৪	১৩৭৪
মোট	৫৩০৪২	২০০৭২	২৯৩০	৭৬০৫১
শতকরা হার	৬৯.৭৫%	২৬.৪০%	৩.৮৫	১০০%

খ. আন্তর্জাতিক মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে নারী ও পুরুষ

আন্তর্জাতিক মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী সম্পর্কিত উপাত্ত এবং টেবিল ৪ এ প্রদর্শিত পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে ছেলে ও মেয়ে হিসাবে মুসলিম ছাত্রদের একটা চিত্র পাওয়া যায় (৩)। আলোচিত ১০টি দেশের একটা সারসংক্ষেপ টেবিল ৫ এ দেয়া হলো।

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মেয়ে এসেছে মালয়েশিয়া থেকে যার অনুপাত ৩১%, তারপর ইরানের স্থান ২৩.৫০% এবং এরপরে আছে নাইজেরিয়া ১৩%। এটা ১৯৮৩/১৯৮৪ সনে যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত সকল মুসলিম মেয়েদের কথা। এই তিন দেশের মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব সকল মুসলিম মেয়েদের ৮৫% এবং যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যায়নরত ছেলে-মেয়ে সব মিলিয়ে সকল মুসলমান ছাত্রদের ১০%। অন্য তিন দেশের মেয়েদের (ছাত্রী) প্রতিনিধিত্ব প্রায় ৩% এবং সকল মুসলিম মেয়ে ও সকল মুসলিম ছাত্রের (ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে) ১% এরও কম।

১৯৮৩/১৯৮৪ সনে যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত পুরুষ ছাত্রদের মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ইরান ২৫%, তারপর মালয়েশিয়া ২০%, অতঃপর সৌদিআরব ১৩%। সকল মুসলিম ছাত্রের মধ্যে এই তিন দেশের প্রতিনিধিত্ব ৫৯%। এ তিন দেশের সাথে নাইজেরিয়া যোগ করলে প্রতিনিধিত্ব দাঁড়ায় ৭১% (পুরুষদের মধ্যে) এবং নারী-পুরুষ মিলায়ে এই হার দাঁড়ায় ৫৭% (যুক্তরাষ্ট্র)।

১৯৮৩/১৯৮৪ সালে আমেরিকায় অধ্যয়নরত সকল আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে নাইজেরিয়া, ইরান, সৌদি আরব ও মালয়েশিয়ার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিধিত্ব ৭৪% (টেবিল ৫)।

টেবিল ৫ : অঞ্চল/দেশ ভিত্তিক মুসলিম আন্তর্জাতিক ছাত্রদের নারী-পুরুষের চিত্র ১৯৮৩/১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দ

দেশ	নারী/পুরুষ (ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
আফ্রিকা			
নাইজেরিয়া	৭,৫৪০	১,৮৯৭	৯,৪৩৭
মিশর	১৯৪৭	৩৯৩	২৩৪০
লিবিয়া	১৬৩৫	৭৫	১৭১০
মধ্যপ্রাচ্য			
ইরান	১৫৫৭৫	৪৭৮৫	২০৩৬০
সৌদি আরব	৮০৯৫	৫৩৫	৪৬৩০
জর্দান	৬৪৪২	৪৪৮	৬৮৯০
লেবানন	৩০৫৯	২৮১	৩৩৪০
কুয়েত	৩৫৫১	২৫৯	৩৮১০
দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া			
মালয়েশিয়া	১২৪৬৯	৫৬৮১	১৮১৫০
ভারত	১১২০	২৫৪	১৩৭৪
মোট	৬১৪৩৩	১৪৬০৮	৭৬০৪১
শতকরা হার	৮১%	১৯%	১০০

গ. অধ্যয়নের ক্ষেত্র

১৯৮৩/১৯৮৪ সালে প্রকাশিত পরিসংখ্যানগত উপাত্ত, যা থেকে মাত্র ১০টি দেশের তথ্য পাওয়া যায় এ সেকশনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ৬নং টেবিলে এ ১০টি দেশের আন্তর্জাতিক ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব জানা যাবে যারা বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ছাত্রদের এক তৃতীয়াংশের উপর (৩৪.৫৯%) ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করছে। তারপরের অবস্থান ব্যবসায় প্রশাসন ২০.৫৪%। আন্ত র্জাতিক ছাত্রদের মধ্যে গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞানে পড়েছে ১১.২৯%, পদার্থ বিদ্যায় ৭.৫৫%। অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেও কমবেশি একই অবস্থা।

টেবিল ৬ : মুসলিম আন্তর্জাতিক ছাত্রদের অধ্যয়নের ক্ষেত্র (১৯৮৩/১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দ)

দেশ	কৃষি	ব্যবসা/ ব্যবস্থাপনা	শিক্ষা	প্রকৌশল	কলা	স্বাস্থ্য বিজ্ঞান	মানবিক	গণিত/ কম্পিউটার	পদার্থ বিজ্ঞান	সামাজিক বিজ্ঞান	অন্যান্য	ইনটেনসিভ ইংলিশ	অনির্দিষ্ট	মোট
নাইজেরিয়া	৫০০	৪০৬৭	৭৩৬	৮৪৯	৪৫২	৪৬০	২১৭	৩১১	৫৪৭	২৪৫	৫৩৭	৯	৩০১	৯৪৩১
মিশর	১২৬	২৯২	১০০	৭৬২	৫৮	২০৩	৯১	১৭৫	২৯২	৫১	৬৭	৩৯	৭৭	২৩৩৩
লিবিয়া	৬৪	১৪৩	৬৮	৭৬	৩৫	৩২	১৮	২৬৫	২০৮	৭০	৩২	১০	৪২	১৭০৩
মোট আফ্রিকা	৬৯০	৪৫০২	৯০৪	২৩২৭	৫৪৫	৮৯৫	৩২৬	৭৫১	১০৪৭	৩৬৬	৬৩৬	৫৮	৪২০	১৩৪৬৭
ইরান	৩৮৬	১৭৫০	৫৪৯	৮৭৭৫	৫৪৯	১২০১	২৪৪	২৬৮৭	২৫২৪	৩৮৬	৬১০	৬১	৬৩১	২০৩৫৩
সৌদি আরব	৯৪	২০৩৬	৫১৭	২৩৬৪	১৭২	১৪৬	২৪১	৮৮৮	৩৫৩	৫৮৬	২৫৮	৬৭৩	২৯৩	৮৬২১
জর্দান	৪৮	৯৩৭	১৯২	৩৬৯৩	১৩৭	২৪১	১৪৪	৫৯৯	২৪৮	৮৯	৮৯	২৪৮	২২০	৬৮৮৫
লেবানন	১৬	৪২৪	৩০	১৯১৭	১০০	১৩৩	৩৬	২৫৭	১০৬	৩৩	৭৩	৯৬	১১৩	৩৩৩৪
কুয়েত	৩০	৯২৯	২৪০	১৫০৪	৩৮	৯৯	৪১	৩৮৪	৮৭	৫৭	৮০	১৫৬	১৬০	৩৮০৫
মোট মধ্যপ্রাচ্য	৫৭৪	৬০৭৬	১৫২৮	১৮২৫৩	৯৯৬	১৮২০	৭০৬	৪৮১৫	৩৩১৮	১১৫১	১১১০	১২৩৪	১৪১৭	৪২৯৯৮
মালোশিয়া	৪১৭	৪৭৯১	৪৫৩	৫২০৯	৮৫৩	২৩৫	৫৬২	২৮১৩	১১৭৯	১৯৯	৪১৭	২৯০	৭২৬	১৮১৪৪
ভারত	১৫	২৩৯	২১	৪৯৭	১৩	৫৪	৪৩	২০৩	১৯৫	১৫	৩৯	২	৩১	১৩৬৭
সর্বমোট দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া	৪৩২	৫০৩০	৪৭৪	৫১০৬	৮৬৬	২৮৯	৬০৫	৩০১৬	১৩৭৪	২১৪	৪৫৬	২৯২	২৫৭	১৯৫১১
সর্বমোট	১৬৯৬	১৫৬০৮	২৯০৬	২৬২৮৬	২৪০৭	৩০০৪	১৬৩৭	৮৫৮২	৫৭৩৯	১৭৩১	২২০২	১৫৮৪	২৫৯৪	৭৫৯৭৬
শতকরা হার	২.২৩%	২০.৫৪%	৩.৮২%	৩৪.৫৯%	৩.১৭%	৩.৯৫%	২.১৫%	১১.২৯%	৭.৫৫%	২.২৭%	২.৮৯%	২.০৮%	৩.৪১%	৯৯.৯৪%

টেবিল ৬ এ একটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায় আফ্রিকার ছাত্রদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে। নাইজেরিয়ার ছাত্রদের দেখা যায় ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ের দিকে একটু বেশি ঝোঁক ৪৩%, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং এ বেশ কম (৯%)। এর বিপরীত চিত্র দেখা যায় মিশর ও লিবিয়ার ছাত্রদের বেলায়। মিশরের ছাত্রদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং এর হার ৩৩%, লিবিয়ায় ৪২%। আর ব্যবসায় প্রশাসনে এ হার যথাক্রমে ১২% ও ৮%। অনুরূপভাবে লিবিয়ার ছাত্রদের মধ্যে গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞানে পড়ার হার ১৫%, মিশর ৭%, নাইজেরিয়া ৩%।

মধ্যপ্রাচ্যের বেশির ভাগ ছাত্র যুক্তরাষ্ট্রে আসে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে (৪২%) (টেবিল ৬)। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা ছাত্রদের এ সংখ্যা আফ্রিকার তুলনায় ৮ গুণ ও দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের তুলনায় ৩ গুণ বেশি। এদের অল্প কিছু সংখ্যক ছাত্র ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পড়ে (১৫%) এবং তা থেকেও কম দেখা যায় গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞানে (১১%)। আর অন্য বিভিন্ন বিষয়ে পড়া ছাত্রের হার হবে ৭%। মধ্যপ্রাচ্যের ছাত্রদের লেখাপড়া তথা বিষয় নির্বাচনের সাথে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার ছাত্রদের মিল আছে। ৩টি বিষয়ের মধ্যে এদের হার হলো ইঞ্জিনিয়ারিং এ ২৯%, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ২৫% এবং গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞানে ১৫%। অন্যান্য বিষয়ে ৭% এরও কম (টেবিল ৬)।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত আন্তর্জাতিক মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে কম ছাত্র দেখা যায় কৃষি, মানবিক শাখা ও সামাজিক বিজ্ঞানে। ১৯৮৩/১৯৮৪ সালের পরিসংখ্যানে এর হার হচ্ছে যথাক্রমে ৩২৬, ৫৭৪ ও ২১৪ জন।

১৯৮৩/১৯৮৪ সালে আন্তর্জাতিক ছাত্রদের মধ্যে যারা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইনটেনসিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ কোর্সে ভর্তি হয়েছিল তাদের সবচেয়ে বেশি এসেছিল সৌদি আরব থেকে ৪২%, এরপর মালয়েশিয়া ১৮%, জর্ডান ১৫% এবং কুয়েত ৯%। এ চার দেশের কমপক্ষে ৮৬% ছাত্র ইনটেনসিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ কোর্সে পড়াশুনা করেছে। এ চার দেশের কর্তাব্যক্তিদের বোঝানোর প্রয়োজন যে, এসব ছাত্রদের এ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স চলাকালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩. মুসলিম আন্তর্জাতিক ছাত্রদের অধ্যয়নের ক্ষেত্র এবং শিক্ষার পর্যায়

টেবিল ৭ এ দেখানো হয়েছে ১০টি রাষ্ট্রের আন্ডার গ্রাজুয়েট ও গ্রাজুয়েট পর্যায়ে মুসলিম ছাত্রদের অধ্যয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্র।

আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রদের সংখ্যা গ্রাজুয়েট ছাত্রদের তিন গুণ বেশি। মিশর ও ভারত ছাড়া অন্য দেশগুলোর ক্ষেত্রে অবস্থা মোটামুটি একই রকম। মিশর ও ভারতে গ্রাজুয়েট ও আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রের অনুপাত ৩ : ১ যা অন্যদের তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত (টেবিল ৭)।

ইঞ্জিনিয়ারিং ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় বেশি আকৃষ্ট হয় গ্রাজুয়েট (৪৮%) ও আন্ডার গ্রাজুয়েট (৬০%) ছাত্ররা। অন্যদিকে, গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞানে আসে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্র (১২%) এবং ভৌত বিজ্ঞানে আসে গ্রাজুয়েট ছাত্ররা (১১%) (টেবিল ৭)।

চার্টগুলোর দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় কৃষি ও মানবিক বিভাগগুলোতে গ্রাজুয়েট ও আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রের সংখ্যা প্রায় সমান। শিক্ষা বিভাগ ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে গ্রাজুয়েট অপেক্ষা আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রের সংখ্যা বেশী। শিক্ষা বিভাগে টেবিল ৭ এ প্রদর্শিত দেশগুলোর মধ্যে প্রায় সবগুলোতেই আন্ডার গ্রাজুয়েট অপেক্ষা গ্রাজুয়েট ছাত্রের চাহিদা বেশি। শিক্ষা বিভাগে সৌদি আরব সবচেয়ে বেশি ছাত্র প্রেরণ করে থাকে। কাজেই শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মুসলিম ছাত্রদের সংখ্যার উপর একটা গবেষণার কাজ চালানো যেতে পারে।

৪. ইঞ্জিনিয়ারিং সাবফিল্ডে মুসলিম আন্তর্জাতিক ছাত্রদের বিতরণ

মুসলিম আন্তর্জাতিক ছাত্রদের প্রায় ৩৫% ১৯৮৩/১৯৮৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য। তাই ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যাগত অবস্থা কি তা দেখা প্রয়োজন (টেবিল ৮)।

মুসলিম ছাত্রদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পড়তে আসে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (৫২৯২)। এর পরের অবস্থান সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (৪,৮৭১) এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (২,৯২৫)। ইরান ছাড়া অন্য ৯টি দেশের মুসলিম ছাত্ররা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অপেক্ষা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বেশি পছন্দ করে। তবে ইন্ড্রাষ্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ছাত্রসংখ্যা সবচেয়ে কম (টেবিল ৮)।

মুসলিম দেশসমূহ হতে যেসব ছাত্ররা পড়তে আসে তাদের মধ্যকার পছন্দ ও প্রয়োজনের সামঞ্জস্যতা আনয়নের ব্যাপারে একটা গবেষণা হতে পারে।

টেবিল ৭ : দেশভিত্তিক মুসলিম ছাত্রদের লেখাপড়ার পর্যায় ও অধ্যয়নের ক্ষেত্র (১৯৮৩/১৯৮৪)

দেশ	কৃষি		ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা		শিক্ষা		প্রকৌশল		সাহিত্যকলা		স্বাস্থ্য বিজ্ঞান		মানবিক		কম্পিউটার ও গণিত বিজ্ঞান	
	আন্ডার গ্রাজুয়েট	গ্রাজুয়েট	আন্ডার গ্রাজুয়েট	গ্রাজুয়েট	আন্ডার গ্রাজুয়েট	গ্রাজুয়েট	আন্ডার গ্রাজুয়েট	গ্রাজুয়েট	আন্ডার গ্রাজুয়েট	গ্রাজুয়েট	আন্ডার গ্রাজুয়েট	গ্রাজুয়েট	আন্ডার গ্রাজুয়েট	আন্ডার গ্রাজুয়েট	আন্ডার গ্রাজুয়েট	গ্রাজুয়েট
নাইজেরিয়া	৩৫৪	১৮১	৩১৬৯	৮৩৭	৩৮১	৩৫৯	৫৫৯	২৫৮	৩৪১	১০১	৪৮৪	১৬৩	৯৫	১১৫	২৩২	৬৩
মিশর	০	১১৬	১০৭	১৫২	৮	৮৮	২৪৯	৫০২	১২	৪৭	৩১	১৬৯	৮	৭৯	৫৫	১১৯
লিবিয়া	৪	৬৪	১১৭	৩৫	৬	৭১	৩৬৮	১৮৭	১৮	২২	৪	৩১	১৩	৬	১৯৬	৬০
মোট আফ্রিকা	৩৫৮	৩৬১	৩৩৯৩	১০২৪	৩৯৫	৫১৮	১২৭৬	৯৪৭	৩৭১	১৭০	৫১৯	৩৬৩	১১৭	২০০	৪৮৩	২৪২
ইরান	২৩৩	১৫৮	১০৩৮	৪৯৭	১৪৩	৪০০	৫৪৪৭	৩৩৪০	৩২৪	১৭৯	৯৭৩	২৬২	১১৭	১১০	১৭৫১	৭৬০
সৌদি আরব	১৬	৮৮	১৬৫৪	২৯৫	৭৪	৪৭০	১৯৯৭	৪২২	১০৯	৫৫	১০৯	৫৩	১০৯	৮৯	৬৯৮	১৩৪
জর্দান	২৭	২৫	৭৫৪	১৩৫	৩১	১৬৫	৩৪১৫	৩০১	১১৯	১৯	১৫১	১০৭	৪৯	৮২	৪৪৮	১০০
লেবানন	৮	১১	৩৪২	৬৯	১০	২২	১৫৬১	৩৫৭	৭৪	১৯	৯৭	৪২	১৮	১৭	১৮৭	৩৮
কুয়েত	২৩	৯	৭৭১	১৮৪	৫৫	১৬৭	১৪০৭	১০১	৩২	৪	২৬	৭৪	২৬	১৫	২৯৩	৫৫
মোট মধ্যপ্রাচ্য	৩০৭	২৯১	৪৫৫৯	১১৮০	৩১৩	১২২৪	১৩৮২৭	৪৫২১	৬৫৮	২৭৬	১৩৫৬	৫৩৮	৩১৯	৩১৩	৩৩৭৭	১০৯৩
মালোশিয়া	২০৫	২৪১	৩৬৪৯	১০১৬	২২২	২২৪	৪৮৯০	৪৬৪	৮৪২	৫২	১৬৩	৮১	৩৯৯	১২৮	২৪৫২	২৩৮
ভারত	১	১৫	৬৬	১০৫৯	৫	১৬	৯০	৪০৭	৩	১০	২০	৩৫	৭	৩৫	৫৫	১৩৮
মোট দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া	২০৬	২৫৬	৩৭১৫	১১৭৫	২২৭	২৪০	৪৯৮০	৮৭১	৮৪৫	৬২	১৮৩	১১৬	৪০৬	১৬৩	২৫০৭	৩৭৬
সর্বমোট	৮৭১	৯০৮	১১৬৬৭	৩৩৭৯	৯৩৫	১৯৮২	২০০৮৩	৬৩৩৯	১৮৭৪	৫০৮	২০৫৮	১০১৭	৮৪২	৬৭৬	৬৩৬৭	১৭১১

টেবিল ৭ (ধারাবাহিক)

দেশ	শারীরিক বিজ্ঞান		সামাজিক বিজ্ঞান		অন্যান্য		ইনটেনসিভ ইংলিশ		অনির্ধারিত		মোট		সর্বমোট
	আন্ডার গ্রাজুয়েট	গ্রাজুয়েট	আন্ডার গ্রাজুয়েট	গ্রাজুয়েট	আন্ডার গ্রাজুয়েট	গ্রাজুয়েট	আন্ডার গ্রাজুয়েট	গ্রাজুয়েট	আন্ডার গ্রাজুয়েট	গ্রাজুয়েট	আন্ডার গ্রাজুয়েট	গ্রাজুয়েট	
নাইজেরিয়া	৩৪৯	১৮৮	১৮৫	৬০	৪০২	১৫৫	০	০	২৬৬	৩০	৬৮১৭	২৫১০	৯৩২৭
মিশর	৪৩	২৫০	১৪	৩১	১০	৫৮	০	৩	৪৫	১৫	৫৮২	১৬২৯	২২১১
লিবিয়া	৯৮	১০০	৫১	২২	২৭	১৩	০	৩	৩৯	৪	১০৪১	৬১৮	১৬৫৯
মোট আফ্রিকা	৪৮৯	৫৩৮	২৫০	১১৩	৪৩৯	২২৬	০	৬	৩৫০	৪৯	৮৪৪০	৪৭৫৭	১৩১৫৭
ইরান	১৭৯০	৭৫৯	২৭২	১০৪	৩৫০	২৪৯	১৩	০	৫১৯	৭৬	১২৯৭০	৬৯০০	১৯৮৭০
সৌদি আরব	১৬৬	১৯৩	৪১২	৪৭	১৬০	১১৬	১১	২	২০৬	৮	৫৭২১	১৯৭২	৭৬৯৩
জর্দান	৯২	১৪৮	৭০	১৯	৪৩	৫১	১১	২	১৭৮	৭	৫৩৮৮	১১৬১	৬৫৪৯
লেবানন	৬৬	৩৮	২৮	৭	৫৬	২৩	৫	০	১০২	৪	২৫৫৪	৬৪৭	৩২০১
কুয়েত	৪৬	৩৭	৩৭	২১	৬০	২৪	৩	২	৯৮	২	২৮৭৭	৬৯৫	৩৫৭২
মোট মধ্যপ্রাচ্য	২১৬০	১১৭৫	৮১৯	১৯৮	৬৬৯	৪৬২	৪৩	৬	১১০৩	৯৭	২৫৫১০	১১৩৭৫	২২৭৫০
মালয়েশিয়া	৮০৫৭	২৮৫	১৪৮	৪১	২৯৫	১১৯	০	০	৬৫০	১৫	১৪৭৭২	২৯০৪	১৭৬৭৬
ভারত	২১	১৭২	৯	৬	১১	২৮	০	০	২৭	২	৩১৫	১০২৩	১৩৩৮
সর্বমোট দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া	৮৭৮	৪৫৭	১৫৭	৪৭	৩০৬	১৪৭	০	০	৬৭৭	১৭	১৫০৮৭	৩৯২৭	১৯০১৪
সর্বমোট	৩৫২৭	২১৭০	১২	৩৫৮	১৪১৪	৮৩৬	৪৩	১২	২১৩০	১৬৩	৫৩০৩৭	২০০৫৯	৭৩০৯৬

টেবিল ৮ : ইঞ্জিনিয়ারিং সাবফিল্ডে মুসলিম আন্তর্জাতিক ছাত্র- ১৯৮৩/১৯৮৪

দেশ	সাধারণ	কেমিক্যাল	সিভিল	বৈদ্যুতিক	শিল্প	যান্ত্রিক	অন্যান্য প্রকৌশল	প্রকৌশল প্রযুক্তি	মোট
নাইজেরিয়া	১১৫	৩০	১৫৩	১০৪	৩৭	৪৭	১০৯	২৫২	৮৪৯
মিশর	১১৪	১৮	১৪৬	১২৭	২০	১১৪	১৭১	৫২	৭৬২
লিবিয়া	৯৪	২৪	১৫৩	১০৯	২৭	৭৩	১৪৬	৯০	৭১৬
মোট আফ্রিকা	৩২৩	৭২	৪৫২	৩৪০	৮৪	২৩৬	৪২৬	৩৯৪	২৩২৭
ইরান	১৫৪৪	৩১৬	১০৩৫	২১০৬	১৭৬	১৩১৬	১০৭১	১২১১	৮৭৭৫
সৌদি আরব	৩৮১	৮৩	৪৩৮	৩৫৯	৭৮	২০১	৩৪৫	৪৮০	২৩৬৪
জর্দান	১১২৩	৯২	৮৪৯	৫৯১	৫৯	২৯২	৪১০	২৭৭	৩৬৯৩
লেবানন	৪৭২	৬৩	৪১৮	৩৭৯	৪০	২৩০	১৮৮	১২৭	১৯১৭
কুয়েত	৪২৫	৩৩	২০৮	১৮৬	১১৯	৮৪	২০০	১৪৯	১৫০৪
মোট মধ্যপ্রাচ্য	৪০৪৫	৫৮৭	২৯৪৭	৩৬২১	৪৭২	২১২৩	২২১৪	২২৪৪	১৮২৫৩
মালয়োশিয়া	৮০৮	২৬০	১৩৮০	১২১৪	১৪৬	৪৮৪	৫৮৯	৩২৯	৫২০৯
ভারত	৪১	৫৭	৩৮	১১৭	৩৪	৮২	১০৭	২১	৪৯৭
সর্বমোট দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া	৮৪৮	৩১৭	৪১৮	১৩৩১	১৮০	৫৬৬	৬৯৬	৩৫০	৫৭০৬
সর্বমোট	৫২১৬	৯৭৬	৪৮১৭	৫২৯২	৭৩৬	২৯২৫	৩৩৩৬	২৯৮৮	২৬২৮৬

৫. পরিচিতিমূলক কর্মসূচি

আন্তর্জাতিক ছাত্ররা পৌঁছানোর পর তাদেরকে নিয়ে একটা পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলে তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের উপর একটা বিরাট ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। আন্তর্জাতিক ছাত্রদের ৩০% মুসলমান বিধায় এ ধরনের পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠানের সুফল অনেক এবং এটা তাদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে অনেক সহায়ক হয়ে থাকে।

ক. পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠান কেন?

যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত আন্তর্জাতিক ছাত্রদেরকে শিক্ষা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে সঠিক পথ নির্দেশ প্রদানের জন্য পরিচিতিমূলক কর্মসূচীর আয়োজন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিচিতিমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে এমন তথ্যপ্রবাহ সঞ্চার করা দরকার যা তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন শেখা তথা শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণে বিশেষ উপকারে আসে। এ সকল বিষয়ের সাথে ঠিকমত পরিচিত হতে পারলে শিক্ষা ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রে ছাত্রদের সফলতা আসবে। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং শিক্ষা ও পেশাগত ক্ষেত্রেও তারা সাফল্যের সাথে কাজ করে যেতে পারবে। যেসব ছাত্র এ ধরনের পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। শিক্ষার কাংখিত গন্তব্যে পৌঁছানো, ইতিবাচক জীবন-যাপন প্রণালীর সুযোগ সৃষ্টি করা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে এসব শিক্ষার্থীরা নানান অসুবিধার মুখোমুখি হয়ে থাকে।

লেখাপড়া সংক্রান্ত

নতুন আন্তর্জাতিক ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠান একাডেমিক ব্যবস্থাপনার প্রতি বেশি জের দিবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষা পদ্ধতির নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আলোচনা করা প্রয়োজন :

১. পদ্ধতির কাঠামো (একাডেমিক পঞ্জিকা, গ্রেডিং ইত্যাদি)।
২. বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো (বিভাগ, রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি)।
৩. ডিগ্রী সংক্রান্ত (কোর্সসমূহ, পরীক্ষা ইত্যাদি)।
৪. ছাত্রদের দায়িত্ব (ক্লাশে উপস্থিতি, আইন-কানুন ইত্যাদি)।
৫. সুযোগ-সুবিধা (গ্রন্থাগার, কম্পিউটার সেক্টর ইত্যাদি)।
৬. আর্থিক বিষয় (ব্যয়, সাহায্য ইত্যাদি)।
৭. ছাত্র সেবা (স্বাস্থ্য, পরামর্শ ইত্যাদি)।

দৈনন্দিন জীবন যাপন

বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রদের প্রধান বিষয় লেখাপড়া হলেও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বাস্তব দিকটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এটা শুধু ছাত্রদের সাধারণ কল্যাণের জন্যই নয়, এর গুরুত্ব এজন্যও যে, জীবন যাপনের মান লেখাপড়াকেও প্রভাবিত করে। মৌলিক মানবিক চাহিদা তাই অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে :

১. আবাসন (ক্যাম্পাসে, লজিং ইত্যাদি)।
২. খাবার (খাদ্য, উপকরণ ইত্যাদি)।
৩. যানবাহন (ট্রাফিক আইন, লাইসেন্স ইত্যাদি)।
৪. যোগাযোগ ব্যবস্থা (টেলিফোন, ডাক সার্ভিস ইত্যাদি)।
৫. অর্থ লেনদেন (ব্যাংকিং, মুদ্রা ইত্যাদি)।
৬. শপিং ও সার্ভিসেস (ইয়োলো পেজ, লণ্ড্রি ইত্যাদি)।
৭. স্বাস্থ্য (ইনসুরেন্স, মেডিকেল ব্যবস্থা ইত্যাদি)।
৮. ইমিগ্রেশন (ভিসা, বদলী ইত্যাদি)।

কৃষ্টিগত সমন্বয়

লেখাপড়ার পরিবেশ ও বসবাসের ক্ষেত্রে খাপ খাইয়ে চলার লক্ষ্যে ছাত্রদেরকে কৃষ্টিগত কিছু বিষয়ে জ্ঞান/অভিজ্ঞতা অর্জন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ছাত্রদের উপকারার্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পরিচিতিমূলক কর্মসূচিতে রাখা যেতে পারেঃ

১. দৃষ্টিভঙ্গি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য/অনানুষ্ঠানিকতা, সময় সচেতনতা ইত্যাদি।
২. যোগাযোগ (আলোচনা, শরীর চালনা ইত্যাদি)।
৩. সামাজিক মূল্যবোধ (আচার-আচরণ, নারীদের ভূমিকা ইত্যাদি)।
৪. ছুটির দিনসমূহ (নির্দিষ্ট দিনসমূহ, অনুশীলন ইত্যাদি)।

খ. মুসলিম আন্তর্জাতিক ছাত্রদের জন্য পরিচিতিমূলক কর্মসূচি

যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতিমূলক কর্মসূচীতে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর অধিকাংশই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তবে এ ধরনের কর্মসূচী সাধারণভাবে মুসলিম ছাত্রদের জন্য বিশেষ করে তাদের পরিবেশ পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে অপর্যাপ্ত। বস্তুতঃ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যারা ছাত্রদের নিকট হতে তাদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে কোন তথ্য গ্রহণ করে না (৮)। ধর্মের স্বাধীনতা, ধর্ম একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার– আমেরিকায় এ জাতীয় সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এটা হয়ে থাকে (৭)। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতিমূলক কর্মসূচিগুলোতে বলতে গেলে কোন মুসলমান কর্মচারী নিয়োজিত নেই বিধায় একটা অমুসলিম সমাজ ও পরিবেশে একজন মুসলিম ছাত্রের অবস্থা কতটা নাজুক হতে পারে সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। 'দি এডুকেশন এন্ড ক্যারিয়ার ইনফরমেশন ব্যুরো' নামক একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান আছে যা মুসলমান

কর্মচারীদের দিয়ে পরিচালিত। তাই তারা মুসলিম ছাত্রদের সমস্যাগুলো বুঝতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সাধারণ পরিচিতিমূলক কর্মসূচীতে যেসব বিষয় ও তথ্য সংযোজন করা হয় যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, তার পাশাপাশি মুসলিম ছাত্রদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন :

লেখাপড়া সংক্রান্ত

১. অধ্যয়নের উদ্দেশ্য : প্রত্যেক ছাত্রেরই শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে একটা নিজেস্ব লক্ষ্য ও প্রেষণা কাজ করে। সে ক্ষেত্রে একজন মুসলিম ছাত্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত উম্মার জন্য সে কি অবদান রাখতে পারবে। সিরিয়াস ছাত্রদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার দ্বারাই এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।
২. শিক্ষা পদ্ধতি ও কলা-কৌশল (পার্থক্যসমূহ/পরামর্শ ইত্যাদি)
৩. কর্মসূচী (শুক্রবারের নামায, অনুপস্থিতর যৌক্তিকতা)

দৈনন্দিন জীবন যাপন

১. আবাসন (ডরমেটরিতে লেখাপড়া, পান ও ধুম পানের নিয়মনীতি।)
২. খাদ্য (হালাল ও হারাম, উপাদান, লেবেলিং, রেস্তোরা ইত্যাদি)।
৩. অর্থ (সুদভিত্তিক হিসাব ইত্যাদি)
৪. স্বাস্থ্য (মহিলা ডাক্তার) ইত্যাদি।

কৃষ্টিগত সমন্বয়

১. বন্ধুত্ব (কো-এড, অনানুষ্ঠানিকতা ইত্যাদি)।
২. ডেটিং ও বিবাহ (অভ্যাস, ইসলামী দিক নির্দেশনা ইত্যাদি)।
৩. মৃত্যু (যানাযা নামায ইত্যাদি)।
৪. ছুটির দিনসমূহ (বিশ্বাস, ইসলামের সাথে দ্বন্দ ইত্যাদি)
৫. ধর্ম (সংগঠনসমূহ, প্রার্থনার সময়সূচী ইত্যাদি)।

মুসলিম উম্মাহর একটি ইসলামী সংস্কৃতি রয়েছে যা কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমায় আবদ্ধ নয়। মুসলমানদের মনে রাখা দরকার যে তারা কোন ইসলামী রাষ্ট্রে বাস করছে না। যখন রোমে থাক, রোমানদের ন্যায় আচরণ কর- এ কথা তাদেরকে আমরা শিখাতে পারি না। সুতরাং আমেরিকার কালচারের মাঝে থেকে তাদেরকে নিজেদের ইসলামী মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের কথা ভুলে গেলে চলবে না। মোট কথা, মুসলমানদের বিশ্বাস হচ্ছে ইসলাম একটি জীবন দর্শন যা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক আচরণ- উভয় ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে। ছাত্ররা যখন ইসলামের এ সকল নির্দেশনা মেনে চলবে এবং আল্লাহকে রাজি-খুশি করাই তাদের লক্ষ্য হবে, তখন নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আগত সমস্যার সুরাহা করা তাদের জন্য সহজ হবে।

৬. ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা

দেশে ফেরার পর মুসলিম ছাত্ররা সমাজের সাথে মিশে যায়। এতে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রে লেখাপড়া করার সময় তারা যেসব মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছিল সেগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে। তাই, আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে দেশে ফেরার পর ছাত্ররা যাতে অর্জিত মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখতে পারে সেজন্য দেশে ফেরার পর আরেকটি পরিচিতি মূলক কর্মসূচী চালু করা এবং এসব পূনর্মিলনীর মাধ্যমে তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত এ কর্মসূচী যুক্তরাষ্ট্রে তাদের অর্জিত ইতিবাচক গুণাবলীকে দীর্ঘদিন ধরে রাখতে সাহায্য করবে, এতে দেশ ও মুসলিম উম্মাহর বিরাট খেদমত হবে বলে আশা করা যায়।

REFERENCES

1. Open Doors: 1984/1985 Report on International Educational Exchange. Instutute of International Education, 809, United Nations Plaza, New York, NY 10017.
2. UNESCO: statistical yearbook, 1984. Paris, France, Table 3.15, "Education at the third level: number of foreign students enrolled."
3. Profiles. Detailed analyses of the foreign student population. 1983/1984. Institute of International Education.
4. Culturgrams: The Nations Around Us. Volume II: Middle East, Asia, Africa, and Pacific Areas. Brigham Young University, David M. Kennedy Center of International Studies, Provo, Utah, 1986.
5. Worldmark Encyclopedia of the Nations. Sixth edition, 1984. Volume 2.
6. Orientation of Foreign Students. Field Service Program, NAFSA, 1860 19th St., N.W., Washington, D.C. 20009. Fall 1980.
7. Computer Systems for International Education. Prepared by the Interassociational Committee on Data Collection: American Association of Collegiate Registrars and Adimissions Officers, Institute of International Education, NAFSA. 1985.
8. The Educational Guide. A Handbook for Foreign Muslim Applicants to U.S. and Canadian Universities. Volume 1. Compiled by the Educational Guide Committee of The Association of Muslim Scientists and Engineers in cooperation with the Muslim Students' Association of the US and Canada 1979 ■

অন্তর্নিহিত সুযোগের মূলনীতি : বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের ইসলামায়নে এর ভূমিকা

এম ইয়ামীন জুবাইরী *

সারসংক্ষেপ

এ প্রবন্ধে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে : ক. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসমূহের একটা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। খ. ইসলামী উত্তরাধিকার থেকে আহরিত নীতিমালাসমূহ। গ. বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এ সকল মূলনীতি সমূহের দাবি এবং ঘ. সমকালীন মুসলমানদের ব্যর্থতার কারণ এবং 'অন্তর্নিহিত সুযোগ' নীতিমালার ভিত্তিতে এর সংশোধনী।

এ ক্ষেত্রে ইবনে খালদুন ও স্যার সাইয়েদ আহমেদ এর ন্যায় প্রথিত যশা পণ্ডিত ব্যক্তিদের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। এসব ব্যক্তিরা ইসলাম তথা মানবতার বৈজ্ঞানিক-কৃষ্টির বাস্তব ও দার্শনিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। বিজ্ঞানের প্রতি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে ইসলামী উত্তরাধিকার থেকে। নিম্নরূপ ক্ষেত্রসমূহে এর পরিধি ব্যাপ্ত : ১. বৈজ্ঞানিক স্বভাব-এর উন্নয়ন : বৈজ্ঞানিক স্বভাব হল– আল-আকল, আল তাদাব্বুর এবং আল-তাফাক্কুর তথা যুক্তির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে কোন কিছু আবিষ্কার করার যে প্রক্রিয়া তা নির্ধারিত হয় বৈজ্ঞানিক স্বভাব দ্বারা । এখানে আলোচনা হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে মানুষের মধ্যে তার পরিবেশ ও প্রতিবেশ সম্পর্কে নানা প্রশ্নের উন্মেষ ঘটায় ও সেগুলো নিরসন করে। এ সকল প্রশ্ন মূলতঃ মানব কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত। ২. দলিল সংরক্ষণ ও জ্ঞানের সঞ্চালন কৌশল যা হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্র থেকে আমরা শিখে থাকি। মুসলমানগণ কর্তৃক গ্রীক বিজ্ঞান আলোচনা ও আধুনিক বিশ্বে তার প্রচলনের মাধ্যমে এগুলোর দৃষ্টান্ত স্থাপন। ৩. সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার নিমিত্তে মৌলিক গবেষণা- ইরতিফাকাত এবং ৪. সামাজিক আচরণ বুঝা ও তা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার।

ভূমিকা

সমকালীন বিশ্বে মুসলমানদের তিনটি চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে উল্লেখিত নীতিগুলো দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে : ক. মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে কমিউনিটি সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা; খ. অন্তর্নিহিত মর্যাদার সমস্যা এবং গ. আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা।

---

* ক্যাটনসভাইল কলেজ অব মেরিল্যান্ড, বাল্টিমোর, মেরিল্যান্ড, ইউএসএ

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্নিহিত নীতিমালা ব্যবহার করতঃ ব্যর্থতার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এ নীতির বক্তব্য হচ্ছে : *'কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার উন্নতির অর্থ হল সেই সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে লুক্কায়িত গুণগত ও পরিমাণগত সম্ভাবনা আবিষ্কার করা এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিষ্ঠা ও যোগ্যতার প্রতিফলন ঘটানো।'* নিষ্ঠার স্বরূপ নির্ণয়ে আনুগত্যের সমস্যা, যোগ্যতার প্রকৃতি নির্ণয় সমস্যা, বিভিন্ন প্রকার সুযোগের উন্নয়ন ও লালন সংক্রান্ত সমস্যা এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

১. ঐতিহাসিক ভিত্তি

সমকালীন মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে গোলমাল দেখা যায় তা মুসলমানদের উত্তরাধিকার ও ভাগ্যোন্নয়ন– উভয় ক্ষেত্রেই একটি চ্যালেঞ্জ। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে ইতিহাসের পাতা থেকে বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপট ও তার সাথে মুসলিম সমাজের সম্পর্কের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। যেভাবেই হোক, ইসলামী উন্নয়নের চাকা পুনরায় সচল করা অত্যাবশ্যক। সমাজ উন্নয়ন ও তার সমস্যা নিয়ে যে সকল পণ্ডিতজন চিন্তা-ভাবনা করেছেন তাদের মধ্যে দু'জনের নাম বর্তমান আলোচনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন হলেন ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রিঃ) এবং অন্যজন স্যার সৈয়দ আহমেদ (১৮১৭-১৮৯৮খ্রিঃ)। তাদের আলোচনা ও লেখনীর মধ্যে তাদের চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে এবং সেসব চিন্তার মধ্যে বাস্তব পর্যবেক্ষণ, উপাত্ত ও সমাজ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন রয়েছে। তাদের আলোচনায় মুসলিম-অমুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ রয়েছে এবং রয়েছে মুসলিম জাতির জন্য বিশেষ উদ্বেগ। ইবনে খালদুন ও সৈয়দ উভয়েই নিজদের অবস্থা উন্নয়নের প্রয়োজনে অন্যদের উন্নয়নের কৌশল পরিহার না করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

এ দুজনের মধ্যে প্রথম জন এসেছিলেন মুসলমানদের পতনের প্রথম যুগে এবং অন্যজন ঠিক চরম অবস্থার সময়। উভয়েই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ হল বিজ্ঞানের প্রকৃতি বুঝতে পারা। মুসলিম সমাজের কোন অংশের উন্নয়নের কথা ভাবতে হলে বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগের কথা ভাবতে হবে। আর বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের পরিধি যুক্তি, সাধারণ জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। বর্তমান আলোচনা শুধু পদার্থ বিদ্যা ও জীববিদ্যার ন্যায় ভৌত বিজ্ঞানের মধ্যে সীমিত নয়। আসলে প্রয়োজন একটা বৈজ্ঞানিক আচরণ যা সকল উন্নয়নের ভিত্তি। এক্ষেত্রে যে মূলনীতিটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো বিজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞানের দেহ

যা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিপালন করতে হয়। বিজ্ঞান হলো জ্ঞানের সেই শাখা যা বস্তুগত বিষয় নিয়ে কাজ করে। বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল করলে চলবে না। আবার বিজ্ঞান চর্চা ও তার পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষাও করা যাবে না। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পদ্ধতি মূল্যবোধ কেন্দ্রিক হলে তার সুফল অনেক বেশি। ইবনে খালদুন একথাই বলতে চেয়েছেন এবং তার এ নীতি শুধু মুসলমানদের নিকট নয়, অমুসলিমদের নিকটও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। ফাগির লিন্ড ও সাহা ইবনে খালদুনকে বিশ্বের প্রথম সমাজ বিজ্ঞানী বলে বিবেচনা করেছেন। এটা কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। ইবনে খালদুন যখন বিজ্ঞানের কথা বলেছেন তখন কারণ, যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতেই সেকথা বলেছেন। ইবনে খালদুনের মতে,

"বিজ্ঞান শিক্ষাও একটা নৈপূণ্য। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের জ্ঞান এবং এর উপর বিশেষ দক্ষতা অর্জন একদিনে সম্ভব নয়। এর উপর দক্ষতা অর্জন করতে হলে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান বিষয়ে খুটিনাটি নানান বিষয় নিয়ে ভাবতে হয়, কাজ করতে হয়। অর্থাৎ এর মধ্যেই তাকে ডুবে থাকতে হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে সমস্যার মোকাবেলা করে তাকে সামনে এগোতে হয়। অবশেষে গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে বিস্তারিত কোন সূত্র বা নীতিমালা বের করায় তিনি সচেষ্ট হন। এভাবে জ্ঞান সাগরে ডুবে থাকা তার একটা স্বভাব বা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। কোন বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞান গবেষকের মধ্যে এ ধরনের স্বভাবসিদ্ধ আচরণের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তিনি কাংখিত ফল আশা করতে পারেন না। বিজ্ঞান চর্চার এ ঐতিহ্য পাশ্চাত্যের (মুসলিম স্পেন) মুসলমানদের মধ্যে আজ আর দেখা যায় না। কারণ স্পেনের সে সত্যতা আর নেই। যখন তার যৌবন ছিল তখন তারা আরোহণ করেছিল উন্নতির সুউচ্চ শিখরে। বিজ্ঞান ও নৈপুণ্যের চর্চা হত তখন ব্যাপকভাবে, আর এসবের চাহিদাও ছিল সে রকম। এরপর শুরু হয় স্পেনে মুসলমানদের পতনের পালা যার সাথে সাথে তাদের বিজ্ঞান গবেষণারও পতন শুরু হয়। বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সেখানে আজ অদৃশ্য হয়ে গেছে, বিজ্ঞান নিয়ে সেই মাতামাতি আর উৎসাহ সবই আজ হারিয়ে গেছে। শুধু আরবী ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছু কিছু চর্চা/গবেষণা এখনও অবশিষ্ট আছে। বুদ্ধিবৃত্তিক বড় বড় বিষয়সমূহের কোন ছায়াও এখন দেখা যায় না। বিজ্ঞান শিক্ষা, শৈল্পিক নৈপুণ্য এবং অন্যান্য সকল প্রথাগত কর্মকাণ্ডে যদি ভাল অভ্যাসগুলো জারী থাকে তা মানুষের মেধা ও মননকে যেমন সমৃদ্ধ করে তেমনি চিন্তার জগৎকে করে আলোকিত। এভাবে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা মানব মন প্রভাবিত হওয়ায় মানুষের বুদ্ধির দিগন্ত আরো প্রসারিত হয়।

বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডকে অবজ্ঞা করার জন্য ইবন খালদুন আরবদের সমালোচনা করেছেন। তার দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে কৃষ্টি, স্থাপত্য, সেলাই, কাঠমিস্ত্রীর কাজ, ধাতুবিদ্যা, পুস্তক প্রকাশনা, চিকিৎসা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। আরবী ফিললজী'র (Philology) ন্যায় এ সকল সহায়ক বিজ্ঞান বিষয়সমূহ শেখা উচিত প্রধান বিষয়ের সাহায্যকারী বিদ্যা হিসাবে। এগুলো নিয়ে খুব বেশি গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

সাইয়েদ আহমেদ খানও ইবনে খালদুনের সাথে সুর মিলিয়ে কথা বলেছেন। যারা সমকালীন শিক্ষা ও বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের আলোকে আগত সমস্যা মোকাবেলা করতে পারে না তাদেরকে তিনি অসভ্য বলে বিবেচনা করেছেন। মোহাম্মদ ইকবাল খানকে প্রথম আধুনিক মুসলিম বলে আখ্যায়িত করেছেন যিনি যুগের গতিবিধি ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার প্রকৃত মহত্ব এখানে যে তিনি প্রথম ভারতীয় মুসলিম যিনি প্রাচ্যে ইসলামের একটি নতুন অভিযাত্রা শুরুর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন এবং সে লক্ষ্যে কাজ করেন। আধুনিক যুগের চাহিদার সাথে তার মন ও আত্মা সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেনি।

সাইয়েদ আহমেদ খান দক্ষিণ এশিয় মুসলমান ও ইউরোপ উভয় অধ্যয়ন করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি তার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ প্রয়োগ করেছেন এবং শেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুসলমানদেরকে অবশ্যই বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি ভারতে 'দি সাইন্টিফিক সোসাইটি' এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিটি আধুনিক শিক্ষিত মুসলমনাই সাইয়েদ আহমেদ খান প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিক্ষার (এর ঐতিহ্য ও বাস্তব প্রয়োজনীয়তার) কাছে ঋণী। বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্বন্ধে সাইয়েদ বলেন,

'বিজ্ঞান ও শিল্পকলা বহুদূর এগিয়ে গেছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তো এতদূর পৌঁছে গেছে যে এর মাধ্যমে সৃষ্টির বহু কিছু এখন প্রকাশিত হয়ে পড়ছে এবং মানব চক্ষুর দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে। বিজ্ঞান নিজেই এখন বলে দিচ্ছে যে, প্রকৃত সত্যের সাথে বিজ্ঞানের কোন সংঘাত নেই। যে ধর্মই হোক, বিজ্ঞানের সাথে যদি তার ভারসাম্যতা না থাকে তাহলে আজ আর সে ধর্ম টিকতে পারবে না। বিজ্ঞানের সাথে যার পরিচয় হয়েছে তার কাছে ধর্মের নামে কোন যুক্তিহীন কথাবার্তা বা গোজামিল গ্রহণযোগ্য হবে না। অনেকে ইসলামকেও এ ধরনের একটি ধর্ম মনে করে। বিজ্ঞানের সত্যের রশ্মির বিচ্ছুরণকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমি নিশ্চিত যে, খাটি ইসলাম যাবতীয় যুক্তি-বুদ্ধিহীন কথাবার্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পরিষ্কার। আমরা আশা করি ইউরোপীয়দের হৃদয়ে যেমন বিজ্ঞান আসন গেড়েছে, তেমনি মুসলিম হৃদয়ও বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত হবে। একই সাথে, আবু বকর (রাঃ)-এর হৃদয় যেমন প্রত্যয়ের আলোয় উজ্জীবিত ও উদ্ভাসিত হয়েছিল, তেমনি মুসলমানদের হৃদয়ও একইভাবে প্রজ্জ্বলিত হোক ঈমানের

দীপ্ত শিখায়।' ইবনে খালদুন 'কুরআনিক হ্যাবিট' নামে এবং সাইয়েদ আহমেদের 'যুক্তির প্রকাশ' এ শিক্ষার যে ধারণা চিত্রিত করেছেন তার মূল কথাও এ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত। মুসলমানদের মধ্যে অনেকে জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানের কথা জানলেও এমন বহু লোক আছে যারা বর্তমান সভ্যতার বিকাশ সাধনে মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদানকে অবজ্ঞা করতেই পছন্দ করে। জর্জ সারটন তার 'হিষ্ট্রি অব সায়েন্স' নামক ক্লাসিক্যাল গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে বিভিন্ন কালে ভাগ করে দেখিয়েছেন। প্রতিটি কালকে তিনি ৫০ বছর করে ধরেছেন। প্রতিটি যুগ বা কালকে সে সময়ের স্মরণীয় ব্যক্তির নামের আলোকে নামকরণ করেছেন। ঈসা (আ.) এর জন্মের পূর্বের যুগকে তিনি প্লেটো, এরিস্টটোল, আর্কিমিডিস প্রমুখ ব্যক্তির নামে আখ্যায়িত করেছেন। ৭৫০-১১০০ সালকে মুসলিম বিজ্ঞানীদের নামে চিত্রিত করেছেন। যেমন- আমরা দেখি জাবির এর যুগ। খারিজমির যুগ, আল রাজি, মাসুদী, আবুল ওয়াক, ইবনে সীনা, আল বিরুনী ও ওমর খৈয়ামের যুগ ইত্যাদি। পরবর্তী ৩০০ বছরেও ইবনে রুশদ, নাসিরুদ্দিন তুসি, ইবনে নাফিস প্রমুখ বিজ্ঞানীর নাম আজও সমুজ্জ্বল। ছয়শত বছরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও কর্মকাণ্ডকে নেহায়েত দুর্ঘটনা বলে আখ্যায়িত করার সুযোগ নেই। পৃথিবীর একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে এ সকল আবিষ্কারের চিহ্ন ও ইতিহাস। আর এ সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পেছনে শক্তি যুগিয়েছে ইসলামী সংস্কৃতি যা ঝর্ণাধারার মত প্রবাহিত হয়েছে উদ্ভাবনী চিন্তা, নতুন নতুন আবিষ্কার ও মুক্ত মত প্রকাশের উৎসমূল হিসেবে। মুসলিম সমাজের বাইরে অন্যান্য ধর্মগুরুরা তখন বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাকে রোধ করতে বদ্ধপরিকর ছিল। এ অবস্থায় বিজ্ঞানপন্থীরা ধর্মীয় নেতাদের হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়েছে অর্থাৎ অন্যান্য সমাজে যখন বিজ্ঞান গবেষণা, যুক্তি ও বুদ্ধির চর্চা, স্বাধীনতা ইত্যাদি পদে পদে বাধাগ্রস্থ ও প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছিল এবং বিজ্ঞান গবেষণার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ হচ্ছিল রীতিমত নির্যাতিত, মুসলমানরা তখন সভ্যতার পত্তন ঘটিয়েছে, কুরআনের আলোকে মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রায় গতি সঞ্চার করেছে। অথচ আজ সেই মুসলমানরাই অন্য জাতির অনুকরণ ও অনুসরণ করছে। অন্যরা যেখানে কুরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করে জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করছে, সেখানে মুসলমানরা কুরআন থেকে সরে গিয়ে চরম দুর্গতি ও পশ্চাৎপদতার শিকার হচ্ছে।

২. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ইসলামী ভিত্তি

মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের কথা বলতে গেলে প্রথমেই যেটা বলতে হয় তাহলো কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিকে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে রূপদান করা অথবা বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডকে কুরআনের সাথে মিলিয়ে দেখা। কোন্ জিনিস বা শক্তি এ দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে কাজ করেছে সেটা প্রথমে দেখা যেতে পারে। কুরআন নিজেই প্রকৃতির ঘটনাবলী বা

কর্মকাণ্ড নিয়ে জ্ঞানবানদেরকে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে, যাকে বলা হয় তাদাব্বুর। কুরআনের এ আহ্বানই মানব মনকে তার চারপাশের বস্তু ও সংঘটিত ঘটনাবলী নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। প্রতিষ্ঠিত পূর্ব বিশ্বাসের চেয়ে সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োগ, অন্ধ বিশ্বাসের চেয়ে চারপাশের ঘটনাবলীর প্রতি পর্যবেক্ষণ এবং সেই আলোকে কোন কিছু বুঝতে শেখা ইত্যাদি জ্ঞান অন্বেষণের পূর্বশর্ত বলে গণ্য হয়ে থাকে। কুরআন বার বার মানুষকে জ্ঞান ও বুদ্ধির দিকে আহ্বান জানিয়ে এবং প্রকৃতির কর্মকাণ্ডে নিহিত নিদর্শন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যুক্তির আলোকে তৌহিদের ধারণা স্পষ্ট করতে চেয়েছে। এক্ষেত্রে কুরআন সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে বিশ্ব ব্যবস্থাপনায় প্রকৃতির আইনের দিকে যা প্রতিটি মানুষের কাছে প্রতিনিয়তই প্রকাশিত হচ্ছে।

﴿وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ - وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ - وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾

'(তারা কি লক্ষ্য করে না) এবং আকাশের দিকে কিভাবে তা উচ্চে স্থাপন করা হয়েছে। আর পর্বতমালার প্রতি কেমন শক্ত করে তাকে গেড়ে দেয়া হয়েছে। এবং যমিনের প্রতি কেমন (সুবিস্তৃত করে) তাকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে?' (৮৮ : ১৮–২০)

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾

'আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য।' (৩ : ১৯০)

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ - وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾

'নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে ধরিত্রীতে– এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না।' (৫১ : ২০-২১)

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾

'অবশ্যই এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন।' (১৬ : ১২)

কুরআন মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার নিকট চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছে, এ বিশাল ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি আছে কিনা তা দেখার জন্য এবং এরূপ কোন একটিও তারা খুঁজে পাবে না।

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ﴾

'যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না; তুমি আবার তাকিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?' (৬৭ : ৩)

কুরআন অবিশ্বাসীদেরকে আহ্বান করেছে,

﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

'এবং তারা বলে, 'ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া কেউ কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না ।' যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।' (২/১১১)

﴿مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ﴾

'যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট হওয়ার পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে।' (৮ : ৪২)

কুরআন বিশ্বাসীদের প্রতি এ পরামর্শ প্রদান করেছে যে,

﴿وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾

'তারা যেন অন্যদের সাথে এমন যুক্তিপূর্ণ ভাষায় কথা বলে যাতে তা তাদের কাছে হৃদয়গ্রাহী ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।' (৪ : ৬৩)

অতঃপর কুরআন মানুষকে তাদের চিন্তা-ভাবনা করার (তাদাব্বুর) ক্ষমতার কথা বলেছে অত্যন্ত সরল অথচ বলিষ্ঠ ভাষায়।

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾

'তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসত তবে তারা তাতে অনেক অসঙ্গতি পেত।' (৪ : ৮২)

এ প্রসঙ্গে এইচ এ আর গিব-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

'মুসলিম সম্প্রদায়ের বাস্তব কর্ম ও চিন্তার বৈশিষ্ট্য এই যে, এদের কর্মকাণ্ড এবং উচ্চ পর্যায়ের চিন্তাভাবনা ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা আইনের সাথেই বেশি সংশ্লিষ্ট।'

এ থেকে অধিক যুক্তির কথা আর কি হতে পারে? যুক্তি ও জ্ঞান বুদ্ধি প্রয়োগের ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি কুরআনের এ তাকিদ থেকে পরবর্তীতে উসুল আল ফিক্হ্ এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে কুরআন চর্চা ও কুরআনের নির্দেশনা মোতাবেক কর্ম পরিচালনা করার যে অভ্যাস গড়ে উঠেছিল তার কারণেই শতাব্দীকাল ব্যাপী তারা একটা ইসলামী ও উন্নত সংস্কৃতি উপহার দিতে পেরেছিল এবং একই সাথে সভ্য বিশ্বকে সর্বপ্রথম এ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছিল কিভাবে চিন্তা, যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও সৃষ্টিধর্মী অভিজ্ঞতা দিয়ে কোন সমস্যার সমাধানের পথে আগাতে হয়।

প্রকৃতিভিত্তিক ইসলামের এ শিক্ষা আইন, বিজ্ঞান ও মানবতার ক্ষেত্রে যে স্থায়ী রূপরেখা প্রদান করেছে তা কোন দুর্ঘটনার ফসল নয়। স্বয়ং কুরআনই মুসলমানদের ইসলামমুখী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিজ্ঞান ও প্রকৃতি কেন্দ্রিক জ্ঞান অর্জনের শিক্ষা দিয়েছে। এর আলোকেই মুসলমানরা তাদের সমাজ ও সভ্যতার ইমারত গড়ে তুলেছে। অন্যদের সাথে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এখানেই। জ্ঞান বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যহীন কোন কথা ইসলাম নির্দিধায় প্রত্যাখ্যান করতে পারে। বিবেক ও জ্ঞানের সাথে যা কিছু সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ইসলাম তাই গ্রহণ করে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। বিজ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক জ্ঞান চর্চার এ কৃষ্টির কারণেই ফিকাহ শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা গড়ে উঠেছিল। প্রতিটি শাখাই কুরআন ও সুন্নাহর যুক্তি নির্ভর ব্যাখ্যার ভিত্তি রচনা করেছিল। প্রতিটি শাখাই বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তির উপর যথেষ্ট জোর দিয়েছে। সময় ও যুগের পরিবর্তনের সাথে ইসলাম মানব প্রয়োজন গুলোর বিভিন্ন বিষয়ে যে যুক্তি ও বিবেক সম্মত উপায়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকে ফিকাহ্ শাস্ত্রের প্রতিটি শাখা সে পদ্ধতি বাতলে দিয়েছে ইজমা, কিয়াস, ইজতেহাদ ইত্যাদির মাধ্যমে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-গবেষণা সংক্রান্ত কুরআনের যেসব কথা রয়েছে সেগুলোর উপর আমি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছি এজন্য যে, কুরআনের এসব ইঙ্গিতবাহী বক্তব্যের কারণে সমাজ ও সভ্যতার উন্নয়নের সকল দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে গেছে, সেটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, আইন শাস্ত্র, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি যাই হোক না কেন। অপরদিকে দুর্নীতি, অশিক্ষা, পুরোহিত তন্ত্র ইত্যাদি বহু নেতিবাচক বিষয়ের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কুরআন থেকে এ সকল বিষয়ে সরাসরি শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকায় মুলমানগণ এদিক দিয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। পাশ্চাত্য দেশগুলো মুসলমানদের কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূলনীতিসমূহ ধার করেছে এবং সেগুলোর পদ্ধতিগত উন্নয়ন সাধন করে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদি গড়ে তুলেছে। আর কুরআন থেকে দূরে থাকা মুসলমানেরা দেখেছে কীভাবে তাদের ধন-সম্পদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্যদের হাতে চলে যাচ্ছে। এসব সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে কতিপয় প্রশ্নের উদ্ভব হয়-

১. মুসলমানদের দেশে অন্যদের নীতি/আদর্শ বাস্তবায়ন করার কোন যৌক্তিক কারণ আছে কি?

২. ইসলামী শিক্ষা ও ইতিহাসে এরূপ কোন নজির পাওয়া যাবে কি যে মুসলমানদের দেশে মুসলিম বিজ্ঞানীরা পরবাসীর মত জীবন যাপন করবে?

৩. এটা কি ভাবা যায় যে, মুসলমানদের কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে অমুসলিমগণ মুসলমান বিজ্ঞানীদের কর্তা (বস্) হিসেবে কার্যপরিচালনা করবে?

৪. কোন্ যুক্তিতে এটা মেনে নেয়া যায় যে, সম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মুসলিম বিজ্ঞানীদেরকে অমুসলিম বিজ্ঞানীদের তুলনায় হীন বা দুর্বল বিবেচনা করা হবে?

৫. মুসলিম বিজ্ঞানী থাকা সত্ত্বেও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রকল্পসমূহ কেন অমুসলিমদের হাতে দেয়া হয়?
৬. এরূপ কেন হচ্ছে যে, মুসলিম বিজ্ঞানীরা নিজের দেশে কাজ করার চাইতে অন্য কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা পেয়েও সেখানে চলে যাচ্ছে ও কাজ করছে?
৭. মুসলমানদের প্রতি মনে প্রাণে বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও অমুসলিম দেশসমূহ কেন মুসলিম বিজ্ঞানীদের বড় বড় প্রকল্পে নিয়োজিত করছে?
৮. মুসলমানদের সংস্থাসমূহ কি সত্যিই উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে?
৯. মুসলমানদের সমাজে লোকদের মেধাযোগ্যতা এমন সব কাজে ব্যয় করা হয় সেখানে কাজের তুলনায় প্রাপ্তি কম। কিন্তু কেন?
১০. কাগজে কলমে বড় বড় বৈজ্ঞানিক ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে, অথচ বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। সাফল্যের পাল্লা শূন্য, বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে কোন স্বাধীনতা নেই, বৈজ্ঞানিক বই-পুস্তক অপ্রতুল। এসব বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না।
১১. আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কেন পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে তুলনা করা যায় না? বিজ্ঞান ভিত্তিক ফাউন্ডেশনগুলো কেন কাংখিত মান অর্জন করতে পারছে না? অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোও কেন বহিঃবিশ্বের সমপ্রকৃতির প্রতিষ্ঠানসমূহের ধারে কাছেও যেতে পারছে না?
১২. মুসলিম দেশসমূহে বিজ্ঞান ও শিক্ষা উন্নয়নের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় তা কিসের ভিত্তিতে দেয়া হয়? এর জন্য সুদূর প্রসারী কোন পরিকল্পনা বা লক্ষ্য নির্ধারিত আছে কী?
১৩. অর্থনীতি ও প্রযুক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট কোন সময়সীমা আছে কি?
১৪. যে ধর্মে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সে ধর্মের অনুসারীদের গড়ে শতকরা ৭০ ভাগ লোকই কেন অশিক্ষিত?
১৫. একটা মুসলিম দেশও কেন আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ও উল্লেখ করার মত একটা সাময়িকী প্রকাশ করতে পারল না?

আল কুরআন এসব প্রশ্নের জবাব দাবি করে। আমরা অনেক ভণ্ডামি করেছি, মেকি মেকআপ ব্যবহার করে নিজেদের চেহারার খুঁত ঢাকার চেষ্টা করেছি, নানান খোঁড়া যুক্তির অবতারণা করেছি। এতে সময় অনেক নষ্ট হয়েছে। নিজেদের ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। অন্যথায়, মারুফ ও মুনকারের যে মিশন ইসলাম আমাদের উপর অর্পণ করেছে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

যুক্তি, বিজ্ঞান, কুরআন, ইসলামের ইতিহাস, অতীত অভিজ্ঞতা সব কিছুই এ কথাই বলে যে, মুসলমানদের বর্তমান হযবরল অবস্থার সংশোধন প্রয়োজন। আমার মতে মুসলমানদের মৌলিক দুর্বলতা হচ্ছে যুক্তি ও বুদ্ধিকে কাজে না লাগানো। আমাদের ক্ষেত্রে এটাই ঘটছে। এর মূল কারণ ও ঘটনাবলী এবং মুসলমানদের মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধনের বিষয়ে কিছু বলার পূর্বে মুসলিম সমাজের বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের তিনটি প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এটা এজন্য প্রয়োজন যে, মুসলিম জাতি ও এর সংগঠন সমূহ আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হচ্ছে, যাকে তারা উন্নয়ন বলছে তা আসলে উন্নয়নের ছদ্মাবরণ। কুরআনে বর্ণিত বক্তব্যের সাথে এসবের কোন মিল নেই।

৩. ইসলামী উন্নয়নের (বৈজ্ঞানিক) শর্তাবলী

ইসলামী উন্নয়নের নির্দিষ্ট মাপকাঠি থাকা প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে যেসব ক্ষেত্রে ইসলামায়নের প্রয়োজন আছে সেগুলোর উপর আলোচনা হওয়া দরকার। শুধু একথায় আত্মতুষ্টির সুযোগ নেই যে, আমরা সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের সমাজকে অনেকটা ইসলামায়ন করতে পেরেছি বা উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়েছি। সমাজ উন্নয়ন বা ইসলামায়নের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে যে দৃষ্টিভঙ্গি ও দিক নির্দেশনা দেয়া আছে সেগুলো অনুসরণ করার মাধ্যমেই কেবল তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। অনেক নৈরাশ্যবাদী বর্তমান পাশ্চাত্য শক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মোকাবেলায় ইসলামের সামর্থ্যের ব্যাপারে সন্ধিহান। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। তাদের মতে, ইসলাম যেভাবে ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়েছে তা থেকে একে উদ্ধার করা একটি দুরূহ ব্যাপার, যত আধুনিক পদ্ধতি ও পদক্ষেপই প্রয়োগ করা হোক না কেন। আরেক দল মনে করে ইসলাম এখন ইতিহাসের পাতায় আবদ্ধ একটি অধ্যায়, এর বেশি কিছু নয়।

ইসলামী শিক্ষার মধ্যে যে বিজ্ঞান মনস্কতা নিহিত আছে সেগুলো যত তাড়াতাড়ি বের করা আনা ও শক্তিশালীভাবে কার্যকর করা যাবে ইসলামের বাস্তবরূপ ততই স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হবে। ইসলামী কালচার ও মূল্যবোধ যে মানব প্রকৃতির সুকুমার বৃত্তি ও বুদ্ধিমত্তাকে বিকশিত করে একথা অনেক অমুসলিম এমনকি মুসলিম পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করতে চায় না। অথচ ইসলাম জ্ঞানবান মানুষদের দৃষ্টি এদিকেই আকৃষ্ট করেছে বার বার। আমি তিনটি বৈশিষ্ট্য বা মাপকাঠির কথা উল্লেখ করতে চাই যেগুলো পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন এবং এগুলো দিয়ে লিটমাস পেপারের মত পরখ করা যায় যে, বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগুলো ব্যর্থ না সফল। সেগুলো হলো–

ক. সমস্যা দূরীকরণ। খ. মর্যাদাকর জীবন যাপন। গ. আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা।

সমস্যা দূরীকরণ

বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে একটি ইসলামী সমাজকে প্রথমেই যে বিষয়গুলোর উপর নজর দিতে হবে তা হলো–

ক. সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা। খ. এগুলো দক্ষতার সাথে মোকাবেলা বা সমাধান করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা। গ. নিজস্ব সম্পদ নিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা এবং এক্ষেত্রে নতুন করে কোন সমস্যা সৃষ্টি না করা।

বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন সাধন কোন সহজ বিষয় নয় যে ইচ্ছে করলেই তা করে ফেলা সম্ভব। বরং এটা একটা দীর্ঘ মেয়াদি কাজ যার সফলতা অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে সঠিক পথ নির্দেশ, সুদৃঢ় মনোভাব ও সহিষ্ণু মানসিকতা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তাড়াহুড়ার কোন সুযোগ নেই। বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের বিষয়টিকে একটি গাছের বেড়ে উঠার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন ক. কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গির বীজ বপন করা, খ. সুশিক্ষা দিয়ে এর শিকড় মজবুত করা, গ. নিজস্ব সম্পদ দিয়ে পরিচর্যা করা, ঘ. মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা, পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন ও সুআচরণ নিশ্চিত করা, ঙ. সকল প্রকার পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই থেকে একে সংরক্ষণ করা। তাহলেই আমরা এর থেকে কাংখিত ফল লাভের আশা করতে পারি, যে ফলের বিতরণ হবে ন্যায়ভিত্তিক ও সমতাপূর্ণ। ধার করা বীজ– অর্থ ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠানের জন্য কেমিক্যাল ধার করা, ধারকরা শিকড় যেমন বিদ্যুৎ ও বিমান চালনার জন্য নিউক্লিয়াস প্লান্ট ও উড়োজাহাজ ধার করা, তেল কূপ খননের জন্য প্রযুক্তি ধার করা, জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র ধার করা- এসবই ক্ষণস্থায়ী ব্যবস্থা মাত্র। এভাবে কোন কার্যকর, টেকসই ও উচু মানের বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন সম্ভব নয়, ইসলামায়ন তো বহু দূরের কথা।

মর্যাদাকর জীবন যাপন

কোন জাতি বা জনগোষ্ঠী যদি মনে করে যে অন্য কেউ তাদের সমস্যার সমাধান করে দেবে তাহলে সেই জাতির আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা একটি অবাস্তব ধারণা। মুসলিম ঐতিহাসিক এইচ আই কেরায়েশীর মন্তব্য এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন-

'আমাদের কখন এ বোধোদয় হবে যে, নিজেদের স্বার্থ ছাড়া কেউ কখনো আমাদেরকে সাহায্য করতে আসবে না বা আমাদের সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হবে না। আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের উপর নির্ভর করা শিখতে হবে তথা আত্মনির্ভরশীল হতে হবে এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে ঐক্যমত্যে পৌঁছতে হবে।' বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্য কুরআন যে দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবস্থাপত্র উপস্থাপন করেছে তার মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের বিবেচনাবোধ। মুসলিম জাতির আত্মমর্যাদা নিয়ে

বেঁচে থাকার জন্য সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হলো ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ন্যায় বিচারের এ বিষয়টি মুসলিম সমাজের জন্য কুরআন বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেছে। ন্যায় বিচারের কথা শুধু কাগজে-কলমে ও সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকলেই চলবে না, তার বাস্তবায়ন জরুরী। ন্যায় বিচার যেমন ধনীরা পাবে, তেমনি পাবে গরীব মানুষেরা, এর সুফল পাবে শাসক ও শাসিত উভয়ই, এর প্রয়োগ মুসলিম অমুসলিম সকলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য হতে হবে।

রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সমানভাবে ন্যায় বিচারের ছায়াতলে আশ্রয় না পেলে কোন জাতি মর্যাদাবান জাতি হিসেবে দাঁড়াতে পারে না। মুসলমানরা আজ নিজেদের বিশ্ব নন্দিত ও ইতিহাস খ্যাত ন্যায় বিচার ব্যবস্থা বাদ দিয়ে তার জায়গায় ত্রুটিপূর্ণ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ পাশ্চাত্য বিচার ব্যবস্থা যেভাবে চালু করেছে তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত ও দুঃখজনক।

পাশ্চাত্যের তথাকথিত ন্যায় বিচার তাদেরকে যেমন ক্ষতি করেছে তেমনি মুসলমানরাও তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, সমাজকে করেছে আহত। এ বিচার ব্যবস্থার পরিবেশে দুর্নীতি এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের দৌরাত্ম বৃদ্ধি পেয়েছে । কুরআনী শিক্ষা কার্যকর করতঃ ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার দায়িত্ব মুসলমানদের, অন্য কারো নয়। (৫ : ৮, ৪৮, ৪ : ১৩৫)

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে আজ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত নেই। বহু দেশে নাগরিকগণ তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। এ কারণে এসব দেশ ও জাতি তাদের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। ইবনে খালদুনের ভাষায়, *'অবিচার সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনে এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত না থাকলে সমাজের মানুষ বিশেষ করে যারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত, কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। মর্যাদা সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে অন্যান্য যেসব বিষয় গণ্য সেগুলো হলো, মোটামুটি মানের একটি দক্ষ সরকার, পরিচ্ছন্নতা, জীবন ধারণের যথাযথ মান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি'*।

মানসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য আর একটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো আমাদেরকে অবশ্যই ভণ্ডামী পরিত্যাগ করতে হবে। পাশ্চাত্যের প্রযুক্তির উন্নয়নে আত্মহারা হয়ে এবং নিজেদের দুর্বলতার কারণে হতাশ হয়ে বহু মুসলিম ব্যক্তিত্ব ও সম্প্রদায় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আসলে আমরা ভণ্ডামিকেই যেন বেছে নিয়েছি। যথাযথ যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক সময় নিজেদেরকে পণ্ডিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করি। অথচ আমাদের শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সাইবোর্ড ব্যবহার করে তার নূন্যতম মানও পূরণ করতে পারে না। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম-ধাম ও আচরণ আমরা কার্যতঃ চুরি করি, কিন্তু সেগুলোর মৌলিক চাহিদা ও সুনাম বজায় রাখতে পারি না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি বিশ্ব প্রতিযোগিতার ময়দানে টিকে থাকার যোগ্যতা রাখে? বিজ্ঞান ফাউন্ডেশনসমূহ কি পারে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে? গবেষণা

প্রতিষ্ঠানগুলো কি সত্যিকার অর্থে কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান? অন্যান্য ইনষ্টিউটিগুলোর অবস্থাই বা কী? আমরা যেসব বিজ্ঞান সাময়িকী প্রকাশ করি তার কোন আন্তর্জাতিক মান নেই, না আছে বিশ্ব সভায় আমাদের বিজ্ঞানীদের মর্যাদা ও দাম। পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে আমরা কিছুটা আত্মতৃপ্তি বোধ করি বটে, কিন্তু তাতে প্রকৃত উন্নয়ন আমাদের হচ্ছে না, বরং ক্রমেই আমরা পিছিয়ে পড়ছি। এ ভণ্ডামীর মানসিকতা আমাদের অধঃগতি ও দুরবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী। অন্য অনেক কারণের সাথে ভণ্ডামী যুক্ত হয়ে মর্যাদাহানীকে আরো বেগবান করেছে। আমাদের কোন কাজকেই কেউ সম্মানের চোখে দেখে না।

আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা

ইসলামী সমাজ কখনও বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না। ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে বিরত রাখার যে মূলনীতি ইসলাম দিয়েছে তাতে একটি মুসলিম সমাজ সবসময় অন্যের মঙ্গল চিন্তায় ব্যস্ত থেকেছে, তা সে মুসলিম-অমুসলিম যেই হোক। মুসলমানরা পরস্পরের প্রতি সমবেদনা জানাবে ও দয়াদ্র হবে (৪৮ : ২৯) এবং তারা একে অন্যের দ্বীনী ভাই এটাই কুরআনের ঘোষণা (৩৫ : ৫, ৪৯ : ১০)। আল্লাহ মুসলমানদেরকে স্মরণ করে দিয়েছেন যে, তিনি উদ্ধত, স্বৈরাচার ও নির্যাতনকারীকে পছন্দ করেন না। তিনি আরো সতর্ক করেছেন যে, তাদের ধন-সম্পদ ও কর্মের হিসাব নেয়া হবে এবং ধন-সম্পদের সদ্ব্যবহার না করলে তারা সেগুলো পাওয়ার যোগ্য নয় বলে সেসব নেয়ামত বন্ধ করে দেয়া হবে (৬ : ৪৪, ৪৫)। অমুসলিমদের সাথে যতই মত পার্থক্য থাকুক না কেন তাদের প্রতি সুআচরণ করার জন্য মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন, সকল মানব সন্তানই পরস্পর ভাই। আল্লাহ খ্রিস্টান ও ইহুদীদের প্রতি যুদ্ধংদেহী মনোভাব পোষণ না করার জন্য মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে, খ্রিস্টান ও ইহুদীদের আল্লাহ আর মুসলমানদের আল্লাহ একই। হজ্জের মূল শিক্ষার মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অন্যতম (৩ : ৯৬)। ইসলামের ইতিহাসে বিশ্ব মানবতার কল্যাণের বহু নজির রয়েছে এবং ইসলামে অসংখ্য বিষয় রয়েছে যেগুলোর উদ্দেশ্য বিশ্ব মানবের কল্যাণ। ধার করা নেতৃত্ব দিয়ে বিশ্ব মানবতার কল্যাণে ব্রতী হওয়া সম্ভব নয়।

কুরআনের আহ্বানের প্রতি ধনী মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অবশ্যই সাড়া দেয়া উচিত। মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে সকল মানুষের জন্য শিক্ষা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী সম্পদ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও ন্যায়ভিত্তিক বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত। বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদনের সূচক নিম্নমুখী হওয়ায় খাদ্য ঘাটতি ক্রমবর্দ্ধমান।

১৯৫০ ও ৬০ এর দশকে খাদ্য রপ্তানীকারী দেশসমূহে উদ্বৃত্ত খাদ্যের যে মজুদ গড়ে উঠেছিল আজ আর সে অবস্থা নেই। বিশ্ব খাদ্য সরবরাহের অবস্থা এখন বেশ শক্ত। এখন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ভূমিক্ষয়ের মাত্রা বেড়ে গেছে। বিশ্বের মোট শস্য উৎপাদনকারী ভূমির ১/৫ বা ১/৩ ভাগ ভূমি ক্ষয়ের আওতায় পড়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের কথা বলা যায়। পাকিস্তানে প্রতি বছর হাজার হাজার একর ফসলি জমি ভূমিক্ষয়ের কবলে পড়ছে। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে খাদ্যের চাহিদা বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি এবং তাদের জনপ্রতি আয়ের হারও বেশি। উন্নয়নশীল দেশসমূহের সাথে উন্নত দেশগুলোর একটি বিরাট ব্যবধান সব ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। এমতাবস্থায় ভারসাম্যহীনতা দূর করার জন্য মুসলিম দেশসমূহের খাদ্য শস্য উৎপাদন, আহরণ, মজুদ সব ক্ষেত্রেই দায়িত্বশীল হতে হবে। যে সকল মুসলিম দেশ নিজেদের দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে পশ্চিমা দেশসমূহে নিজেদের সম্পদ পাঠিয়ে থাকে তারা মুসলমান হিসেবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়।

বর্তমান বিশ্ব দুটি দলে ভাগ হয়ে গেছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল, স্বার্থপর ও শোষক এবং সম্পদহীন ও শোষিত, স্বাধীন ও নির্যাতিত, অন্যের সম্পদে ধনবান এবং নিজেদের দোষে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র, চৌকস ও বুদ্ধিমান এবং হতভম্ব। মানবতার এ ধরনের বিভাজন কুরআন অনুমোদন করে না। মানব সভ্যতার এক ন্যায়ভিত্তিক নেতৃত্বের জন্য আজকের বিশ্ব হাপিত্যেস করছে। বর্ণবাদী জুডি ও খ্রিস্টান সমাজ বিশ্বকে এরূপ একটি অনিয়মতান্ত্রিক সমাজ উপহার দিয়েছে। কিন্তু নিজেদের ব্যাপারে তাদের হিসেব-নিকেশ অন্য রকম। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, সম্প্রতিকালে তৃতীয় বিশ্বে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের উন্নয়নে তারা কিছু সাহসী ভূমিকা রেখেছে। ভ্যাটিকানের কার্ডিনাল জোসেফ র‍্যাজিংগার তার 'থিওলজি অব লিবারেশন' নামক লেখায় উল্লেখ করেন–

'দাতব্যকর্ম এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সেবা করা অবশ্যই খ্রিস্টানদের কর্ম তালিকায় অগ্রাধিকার পেতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদী স্বৈরাচারী শাসন খতমের লক্ষ্যে প্রয়োজনে শেষ ব্যবস্থা হিসেবে অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়াও ন্যায়সঙ্গত হবে। কারণ এ স্বৈরশাসনই ব্যক্তি ও সমাজের মৌলিক মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় দুশমন।'

পশ্চিমা বিশ্ব দুর্নীতিপরায়ণ সমাজ সংশোধনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বরং কখনো কখনো তার প্রতি সমর্থন যুগিয়েছে। তারা যখন উপনিবেশিক শক্তি হিসেবে কোথাও শিকড় গেড়েছে অথবা তল্পী বাহকদের সাহায্য করেছে সেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকারের প্রতি তারা দেখিয়েছে চরম অশ্রদ্ধা। ফিলিপাইনে স্বৈরশাসক

মার্কসের পতনে কোরাজন একুইনোকে সমর্থন করেছিল কার্ডিন্যাল জেইম সিন। তখন ভ্যাটিক্যান থেকে তাকে ভীষণভাবে তিরস্কার করা হয়। স্বৈরাচারী শাসকদেরকেই জনগণের বন্ধু ও হিতাকাংখী বলে মহাপ্রচার চালায় এ পাশ্চাত্য। তাদের ইতিহাস এরকম নজিরে ভরপুর। মুখে জনমানুষের কল্যাণের কথা বলা আর বাস্তবে স্বৈরশাসকদেরকে সমর্থন যোগান এটাই পাশ্চাত্যর নীতি।

মূলকথা হচ্ছে অন্যান্য দেশে মানব কল্যাণমুখী কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাকে পাশ্চাত্য কখনো তাদের দায়িত্ব বলে মনে করে না। তাদের লক্ষ্য শুধু নিজেদের স্বার্থ বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। একজন নিঃস্বার্থ পৃষ্ঠপোষক খুঁজছে আজকের বিশ্ব সভ্যতা, ইসলাম যা দিতে পারে। বস্তুতঃ এ রকম একটি বৈরী পরিবেশেই ইসলাম এসেছিল মানব সমাজের সংস্কারের কর্মসূচী নিয়ে। মুসলমানদের দেশে যে কোন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজন অনুরূপ আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব। সত্যিকার অর্থে মানবতার মুক্তির কর্মসূচী নিয়ে যে নেতৃত্ব উপস্থাপিত হবে তা শুধু মুসলমানদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে তাই নয়, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী ও বস্তু পূজারী শাসকদের স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক শাসনের যাতাকলে পিষ্ট সাধারণ নাগরিকরাও এতে স্বস্তি ফিরে পাবে এবং উপকৃত হবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

৪. সমাধানের সন্ধানে অন্তর্নিহিত সুযোগের মূলনীতি :

কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গি ও তার আলোকে বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে লক্ষ্যে পৌছার জন্য একটা কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গি হবে প্রেরণার উৎস, লক্ষ্যে পৌছার চেতনা এবং মানব গোষ্ঠী তথা 'খলিফারাই' হবে এসব উন্নয়ন ও শাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যম। অতঃপর এর সাথে প্রয়োজন নিষ্ঠা, যোগ্যতা, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি। এসব কিছু মিলে সৃষ্টি হয় অন্তর্নিহিত সুযোগের মূলনীতি (Principle of Intrinsic Opportunity)। এরপর প্রয়োজন সঠিক কর্মপদ্ধতি। এক্ষেত্রে নিম্নের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

'কোন জনগোষ্ঠীর (যে শ্রেণীরই হোক না কেন) গুণগত ও পরিমাণগত যে কোন ধরনের উন্নয়নের জন্য দুটি জিনিস বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এক. প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা, দুই. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকের কাজের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা এবং ঐ কাজের জন্য যোগ্যতা।'

উম্মাহ চেতনা

মুসলমানদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক উন্নয়নকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যে পরিবর্তনের কথাই ভাবা হোক না কেন, তার শুরুটা হতে হবে একেবারে গোড়া তথা ইসলামী সমাজের মূল ইউনিট থেকে। উম্মাহর চেতনাকে শক্তিশালী করার জন্য জনগোষ্ঠীর নিজেদের ভিতর থেকে একটা আগ্রহ ও উৎসাহ কিভাবে সৃষ্টি করা যায় সে বিষয়টি

গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য মুসলিম জাতীয় ঐক্যের লক্ষ্যে যারা আন্তরিকভাবে কাজ করেছে তাদেরকে গ্রুপ, উপদল, এর আকার, বৈচিত্র ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে হয়েছে খুব বেশি। সত্য বলতে কি, মুসলিম সম্প্রদায়কে উম্মাহর চেতনা এখনও উজ্জীবিত করছে, প্রেষণা যোগাচ্ছে। কিন্তু কার্যতঃ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এর বিপরীত চিত্র। পাকিস্তানের খণ্ডিত হওয়া, লেবাননের আন্ত-কোন্দল, ইরাক-ইরান যুদ্ধ ইত্যাদি আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলে, উদ্বিগ্ন করে। মুসলমানদের মধ্যে আন্তঃসম্প্রদায় দ্বন্দ কোন নতুন ঘটনা নয়। মুসলিম ইতিহাসের গোড়া থেকে শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্বের যে বিষ-বাষ্প ছড়াতে শুরু করেছে তার তীব্রতা এখনও গোটা উম্মাহর ঐক্যের বন্ধনের প্রতি হুমকী স্বরূপ। ইবনে খালদুন প্রথম পণ্ডিত যিনি এ আন্তগোষ্ঠী দ্বন্দ্বের মনস্তাত্ত্বিক দিক নিয়ে কথা বলেন। পাশ্চাত্যে সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন হেগেল এবং সম্প্রতিকালে দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে এ দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ করেন জালিবি। সাইয়েদ আহমেদ এ গ্রুপ বা উপদলকে কওম বলে আখ্যায়িত করেন। তার মতে কওম বলতে পরিষ্কারভাবে কোন দেশ বা জাতি বুঝায় না। মুসলমানদের মধ্যে কওম বলতে ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বুঝায়।

সমসাময়িক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অবস্থা বিশ্লেষণ করলে মানব সমাজের মৌল কাঠামোর (Base Group) গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সাদা চামড়ার জুডিও-খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয়। এদের প্রত্যেক ব্যক্তি এবং উপদলীয় গোষ্ঠী নিজেদের বাস্তব অবস্থার কথা বিবেচনা করে বৃহত্তর জাতি স্বার্থে নিজেদের করণীয় নির্ধারণ করেছে। এ জাতীয় ঐক্য ও সংহতির কারণেই যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করে। আমেরিকার সাথে তাদের এ সখ্যতার কারণেই ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো বিশ্বকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করার সুযোগ পায়। একই চেতনা দূর দেশে ইজরাইল, অস্ট্রেলিয়া ও সাদা চামড়ার দক্ষিণ আফ্রিকায় শিকড় গাড়তে সাহায্য করে। জাপান ও ভারত বিশ্বের সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ক্ষমতাধর রাষ্ট্রেগুলোর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক নেতৃত্ব কিন্তু ঐ গ্রুপের হাতেই রয়ে যায়। এমনকি ইহূদী জাতিও আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের কাছে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত ট্রায়াল পর্যায়ে ছিল। অবশেষে ৬০ এর দশকে আমেরিকান একাডেমিক ইনষ্টিটিউটশনগুলো আইভি লীগ কলেজে ইহুদী ছাত্রদের ভর্তি শুরু করে। এ গ্রুপের প্রত্যেককে গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে তাদের যোগ্যতা প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ দেয়া হয়। এর দ্বারা তারা দুটি কাজ সম্পন্ন করল-

১. নিজ সম্প্রদায়ের সমস্যাবলী চিহ্নিত ও সমাধান করা ;

২. আন্তর্জাতিক সম্প্দ্রায়ের প্রতি তাদের দায়িত্ব পূর্ণ করা।

প্রথমতঃ নিজস্ব কৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব, দ্বিতীয়ত, অন্যদের প্রতি দায়িত্ব পালন।

এলান বুলকের ভাষায় :

'কোন সংগঠনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে এর জন সম্পদ ও তার মেধা, অভিজ্ঞতা এবং আনুগত্য। এগুলোর জন্য শিক্ষা, কর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা ও সংগঠনকে সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকারের মাধ্যমে যে বিনিয়োগ করা হবে তার বিনিময় (Returns) সংশ্লিষ্ট সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, ইমারত ও সরঞ্জামাদী অপেক্ষা অনেক বেশি।'

বেইস গ্রুপের পরিসর যত বিস্তৃত হবে নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন যোগ্য লোকও তত বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। জীববিজ্ঞানের হিসাব মতে এ প্রক্রিয়ায় 'জীন পুল' বিস্তার লাভ করে। ইসলাম এ বেইস গ্রুপের কথাই বলে থাকে যার নাম উম্মাহ। তবে জুডিও-খ্রিস্টান শ্বেত গ্রুপের মত উম্মাহ কোন বর্ণবাদী ধারণা নয়। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তার স্বাক্ষী। কাউকে বাদ দিয়ে নয় বরং ইসলামী জীবনাদর্শে বিশ্বাসী সকলেই এর আওতাভুক্ত এবং সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখাই উম্মাহর প্রধান শ্লোগান (৩ : ১১০)। মুসলমানেরা এ ব্যাপক ভিত্তিক উম্মাহর ধারণা ও আদর্শ পরিত্যাগ করেছে বিধায় ইসলামায়নের চিন্তাও আজ অনুপস্থিত। বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের স্বার্থে যে বেইস গ্রুপের প্রয়োজন শক্তিশালী উম্মাহ্র ধারণা থেকেই সেটা পাওয়া সম্ভব। মুসলমানদের মধ্যে অনেক যোগ্য মানুষ আছে। কিন্তু নিজেদের ভূ-খণ্ড সীমার বাইরে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের তেমন পরিচিতি বা স্বীকৃতি নেই। মুসলমানদের মধ্যে এমন অনেক প্রতিভাবান লোক আছে যারা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের চেয়ে খৃস্টান জগতে বেশি পরিচিত। এমনকি আন্তঃসম্প্রদায় দ্বন্দ ও মত পার্থক্যের কারণে অনেকে নিজের দেশেও অপরিচিত ও অনাহুত। ফলে উম্মাহর আকৃতি ক্রমেই ক্ষুদ্রতর হতে চলেছে। নিজেদের ক্ষুদ্র উপদল সৃষ্টি এবং পরস্পরের প্রতি অনাস্থার কারণে উম্মাহর মহা দিগন্ত যেন সংকুচিত হচ্ছে এবং সৃজনশীলতার স্রোতধারা গতিহীন হয়ে পড়ছে। ব্যক্তিগতভাবে আমরা এতে অন্যের মেধার প্রতি ঈর্ষান্বিত হচ্ছি, তাদের সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে ভীত হচ্ছি। অন্যের মতের সাথে বিনা কারণে দ্বিমত পোষণ করছি। একইভাবে সমষ্টিগতভাবে আমরা একদেশের মুসলমান অন্য দেশের মুসলিম ভাইদের প্রতি বৈরি আচরণ করছি। কেউ মনে করছি তাদের থেকে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি উন্নত, কেউ বা মনে করি আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ অন্যদের থেকে শ্রেয় ও পরিপাটি, আবার কেউ বা ভাবি আমাদের খাদ্য খাবারের মান অন্যদের চেয়ে অনেক উন্নত ও রুচিসম্মত। এ ধরনের মানসিক অবস্থার কারণে এটা দেখে আশ্চর্য হতে হয় নি যখন পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত একটি অতি উচু পর্যায়ের আমেরিকান বিজ্ঞানীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের কতিপয় ভাল সুপারিশও গ্রহণ করতে পারেনি। এ সব বিজ্ঞানীদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন পাকিস্তানী নোবেল বিজয়ী এক বিজ্ঞানী। তিনি পাকিস্তান সরকারের বৈজ্ঞানিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচির

ভুলত্রুটিগুলো তুলে ধরেন এবং তা সংশোধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। তার কোন সুপারিশ গৃহীত হয়নি। স্থানীয় কৃষ্টি ও জাতিগত পার্থক্যের কারণেই হয়ত আমাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসহীনতার অবস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকবে। অথচ আমাদের সামনে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ। অসংখ্য কৃষ্টিগত ও উপদল তথা জাতিভেদের দেশ এ যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু লক্ষণীয়, তারা এসব ক্ষুদ্র জাতি, ভাষা ও কৃষ্টিগত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে বিশ্বের প্রযুক্তিগত উন্নয়নে কিভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে মেধার সমন্বয় ঘটিয়েছে এবং কাজ করছে। এ থেকে সারা বিশ্ব শিক্ষা নিতে পারে। মুসলিম দেশসহ সারা বিশ্ব থেকে মেধাবী মানুষগুলো আজ ছুটছে যুক্তরাষ্ট্রে। কেন? অনুকূল পরিবেশ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে বলেই আজ সেখানে মেধার মেলা বসছে। মেধার বিকাশ ঘটছে সেখানে। কিন্তু আন্তঃগ্রুপ কোন দ্বন্দ্ব নেই। সবাই কাজ করছে যার যার মত।

ইসলামী উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে উম্মাহর বেইস গ্রুপ থেকে বাছাই করতে হবে এবং তাদের কাছে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিষ্কার থাকতে হবে। বিশেষ করে সমস্যা সমাধান, মর্যাদাকর জীবন যাপন ও আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্বের বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামের বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে যারা বাধা দান করে না এমন সব সংখ্যালঘু ও অমুসলিমদেরকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে উপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজেদের আন্তরিকতার স্বাক্ষর রেখেছে এমন লোকদেরকে সমস্যা সমাধান কর্মসূচীতে নিয়োজিত করা উচিত। টাকা দিয়ে আন্তরিকতা কেনা যায় না। উন্নয়নের জটিল বিষয়গুলো নিষ্ঠাবান লোকদের হাতে ন্যস্ত করতে হবে (কোরআন ৩ : ১১৮)। দেখা গেছে অনেক মুসলিম রাষ্ট্রই নিজেদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পাশ্চাত্যের নিম্নমানের অপরিচিত বিশেষজ্ঞদেরকে নিয়োজিত করে। এটা সময় ও অর্থের অপচয় ছাড়া কিছু নয়। কুরআনের শিক্ষা ও নির্দেশিকা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা কোনটাই এ ধরনের পরমুখাপেক্ষিতা ও হীনমন্যতার প্রশ্রয় দেয় না। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এসব অপরিচিত তথাকথিত বিশেষজ্ঞগণ তাদের নিজেদের সমাজে অখ্যাত বা প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তি। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভাব এবং অদক্ষতার কারণে এসব লোক উন্নয়নশীলদেশ সমূহের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সঠিক পথ নির্দেশ দানে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে, উন্নয়নশীল দেশ সমূহে তারা বিলাসবহুল জীবন যাপন করে এবং যোগ্যতা অপেক্ষা অধিকতর সুযোগ-সুবিধা আদায় করে থাকে। এর বিনিময়ে তারা দিতে পারে খুব সামান্যই। আসলে আন্তরিকতা এমন একটি জিনিস যা মানবস্বভাবের আন্তর্নিহিত একটা বিষয়, অর্জন করার জিনিস নয়।

একটি সংগঠনে মানব সম্পদের মধ্যে যোগ্যতার প্রতিফলন অতি গুরুত্বপূর্ণ, ইসলামায়নের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। অযোগ্য লোকদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ না করার জন্য আল কুরআনে পরামর্শ দেয়া হয়েছে (৪ : ৫) এবং যারা ধর্ম ও যাযকতন্ত্রের নামে ধন-সম্পদ কুক্ষিগত ক'রে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে (৯ : ৩৪)।

নবী (ﷺ) সমাজের সবচেয়ে যোগ্য লোকদেরকে নেতৃত্বের জন্য নির্ধারিত করার জন্য মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছেন এবং নিজে বাস্তবে সে কাজটিই করে দেখিয়েছেন। ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি উপযুক্ত লোকদেরকে নিয়োগ দান করেছেন। এ কথা মনে রেখে বর্তমান যুগেও যোগ্য লোকদেরকে সেভাবে মূল্যায়ন করে কাজে লাগাতে হবে। যোগ্যতার ইসলামায়নে তিনটি জিনিস বিশেষভাবে দেখতে হবে-

১. বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা;

২. উন্নয়নশীল সমাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং

৩. সৃজনশীলতার বিকাশ।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দৃশ্যপটে যখন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভাব দেখা দেয়, তখন অযোগ্যতা ও বিশেষায়িত জ্ঞানের অভাবও তার সাথে যোগ দেয়। অথচ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুটনের জন্য এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ষাটের দশকে একমাত্র টক্সিকোলজিস্ট (যা পাকিস্তানের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদ) হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় তা সুখকর নয়। লয়ালপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের এক ডজনেরও বেশি কলোনী নজরে পড়ে যেখানে বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ বিলাসবহুল ইমারতে বাস করছিল। এগুলোর শুধু শীততাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে অর্থ ব্যয় হত তার পরিমাণ আমার বেতন অপেক্ষা বেশি। অথচ তাদের একজনেরও উল্লেখযোগ্য কোন পেশাগত দক্ষতা ছিল না। পাশ্চাত্যের প্রকৃত বিশেষজ্ঞগণ দেশেই থাকে। বাইরে আসলে তারা আসে গানার মিরডাল এর ভাষায়, তাদের শাসনাধীন দেশসমূহের *'লোকদের উপর গবেষণা করতে।'* অন্যদের উপর অনর্থক আস্থা স্থাপনের অর্থ নিজেদের লোকদেরকে খাট করে দেখা। বহু মুসলিম রাষ্ট্রে দু'প্রকার বেতন স্কেল আছে। নিম্নমানের বেতন স্কেলটি স্বদেশীয় ভাইদের জন্য, যদিও শিক্ষা ও অন্যান্য যোগ্যতায় তারা বিদেশী প্রতিপক্ষের সমান বা ক্ষেত্র বিশেষ শ্রেয়। এ ধরনের অভ্যাস ও মানসিকতা কুরআন সমর্থন করে না এবং বিজ্ঞান উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ অনিয়ম কোন সুফল বয়ে আনতে পারে না। বস্তুতঃ মুসলিম সংগঠনগুলোতে কর্মচারীদের যোগ্যতার দিকটি উপেক্ষা করা একটা ব্যাপক প্রচলিত ও খারাপ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মুসলমানদের বিজ্ঞান উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ অভ্যাস খুবই ক্ষতিকর।

পেশাগত ক্ষেত্রে অযোগ্য লোক নিয়োজিত হলে সত্যিকার উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়, ইসলামী মূল্যবোধ ভিত্তিক জীবন যাপনে লোকেরা নিরুৎসাহিত হয়, দুর্নীতি উৎসাহিত হয়, যোগ্য লোকদের সৃজনশীলতা ও সুযোগ-সুবিধা অস্বীকার করা হয়।

বর্তমান আলোচনার আর একটি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়। যেমন শিক্ষা ও আন্তরিকতা আছে, কিন্তু যোগ্যতা নেই, বা যোগ্যতা আছে কিন্তু

শিক্ষা নেই, সুযোগ-সুবিধাও নেই সেক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিও কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনে সক্ষম হয় না। সবচেয়ে বড় কথা হল শিক্ষা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যদি সংশ্লিষ্ট গবেষক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা না হয় তাহলে কোন উন্নয়ন কর্ম বা উৎপাদনমুখী কর্মই কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। যোগ্য লোকদের প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা না হলে শুধু যোগ্যতা ও নিষ্ঠা কোন কাজে আসবে না। আমাদের মানব সম্পদের সবচেয়ে যোগ্য লোকদের কাজে অযোগ্য লোকদের অনাহুত হস্তক্ষেপ ও খবরদারী বন্ধ করতে হবে। মুক্ত মনে ও অবাধে তাদেরকে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। হতাশ আমলাতন্ত্র ও কায়েমী স্বার্থবাদিতার হাত থেকে প্রকৃত প্রতিভাবানদের মুক্ত রাখতে হবে। এভাবে মুসলমানদের নিষ্ঠাবান ও যোগ্য মানবসম্পদ যদি সামনে চলে আসতে পারে ও মেধার প্রকাশ ঘটতে শুরু করে তাহলে উন্নয়নের মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যাবে। উন্নততর জীবন ও আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব তখন আবার মুসলমানদের হাতে চলে আসবে এবং মুসলমানরাও তখন সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে যার আলোকপাত করা হয়েছে আল কুরআনে। পাকিস্তানে অবস্থানকালে আমি লক্ষ্য করেছি বিজ্ঞানের বেশ কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিশেষজ্ঞ তৈরি হয়েছে। কিন্তু এ যোগ্য ও গুণী মানুষগুলো কমযোগ্য ও অযোগ্য লোকদের দ্বারা প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। অযোগ্য লোকগুলো মধ্যম মেধার লোকদের সাথে জোট বেঁধে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডের একটা পাল্টা প্রবাহ সৃষ্টি করে ফেলেছে। মেধাবী মানুষগুলো অযোগ্যদের অধীনস্থ হয়ে পড়ে এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় নির্বাহী সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে থাকে এ অ-পেশাজীবীদের দ্বারা। দেখা গেল, কর্ণ ব্রিডিং বিষয়ে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য ঐ ডিসিপ্লিনের একজন বিশেষজ্ঞকে দাওয়াত করা হলে সেখানে পাঠনো হল হুইট ব্রিডিং এর একজন কম যোগ্যতাসম্পন্ন ও অনুৎপাদনশীল ব্যক্তিকে। একজন যোগ্য ও প্রকাশনা সমৃদ্ধ বিজ্ঞানী তার কোন গবেষণাকর্ম প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দিলে সংশ্লিষ্ট বস নিজের নামে তা প্রকাশ করার জন্য ঐ বিজ্ঞানীকে চাপ দিতে থাকে এবং কখনো কখনো তাতে সফলও হয়। এক পর্যায়ে আমি দেখলাম ২০ জন কর্মকর্তা যারা বৈজ্ঞানিক প্রজেক্টসমূহ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে তাদের কারও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোন প্রশিক্ষণ নেই এবং প্রকৃত বিশেষজ্ঞদের বিশেষজ্ঞ কর্মের যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। এভাবে বারবার আমাদের নিষ্ঠাবান ও যোগ্য মেধাকে এ যুগের ইবনে খালদুন, ইবনে সিনা ও ইবনে নাফিস হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যোগ্য লোকের অভাবে এমন হচ্ছে তা নয়, বরং যোগ্য লোকগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন না হওয়াই এর মূল কারণ। অন্যদিকে, আমাদের হতাশার কারণে মেধার পাচার হচ্ছে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে অযোগ্য লোক মনোনীত করার ধারা অব্যাহত রয়েছে। অচিরেই এমন অবস্থা

আসবে যে পাচার হবার মত আর কোন মেধাই থাকবে না। যোগ্য লোকেরা তখন আর নিজ দেশে বা অন্য কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে ফেরার আগ্রহ দেখাবে না। নিজের দেশের মানুষের দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার আশঙ্কা ও নিরাপত্তাহীনতার ভীতি তাদেরকে এ অবস্থায় নিয়ে গেছে।

যোগ্য লোকদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়টি ভিতর থেকে উপলব্ধি করার ব্যাপার। আমাদের কৃষ্টিতে এর অনুশীলন থাকতে হবে। বাইরে থেকে কেউ এটা প্রতিষ্ঠা করে দিতে পারবে না। কোন প্রেসিডেন্ট, জেনারেল বা রাজার সদিচ্ছা দ্বারাও এটা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। একে জাতীয় কৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করতে হবে। কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গিও এটা যে, যারা যোগ্য ও নিষ্ঠাবান তাদেরকে উপযুক্ত স্থানে বসাতে এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মওদূদী (রঃ) এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন- *'প্রত্যেক ব্যক্তিকে (ইসলামী সমাজে) তার ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে এবং যোগ্যতা ও মন-মানসিকতা অনযায়ী স্ব স্ব ক্ষেত্রে যতদূর কৃতিত্ব অর্জনে সে সক্ষম তার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে।'* আজকের যুগে এ ধরনের ইসলামী সমাজের কোন অস্তিত্ব নেই এবং এ পথে অগ্রসর হওয়ার মত কোন লোকও দেখছি না।

৫. সুযোগ-সুবিধা প্রদানকারী ও বাধাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

একটা সমাজে দীর্ঘদিন ধরে কোন মানবিক দুর্বলতার চর্চা হতে থাকলে তা ধীরে ধীরে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এ ধরনের কিছু কিছু দুর্বলতা প্রতিভাবান মানুষদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তানে চাকরির সুযোগ-সুবিধা নির্ভর করে ব্যক্তি কোন এলাকার লোক তার উপর। এটা একটা মারাত্মক ধরনের 'নাগরিকত্ব' ধারণা। জাতীয়তা, ভাষা, উপদলীয় সংস্কৃতি প্রীতি, বর্ণ, ধর্মীয় উপদল ইত্যাদি ধরনের আঞ্চলিক বিভাজন প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাজমান। মত প্রকাশে স্বাধীনতার অন্তরায়, গণতান্ত্রিক আচণের অভাব, যাজকতন্ত্র, আত্মসমালোচনার অভাব, কায়েমী স্বার্থবাদী গ্রুপ, দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতি, গোষ্ঠীতন্ত্রের আনুগত্য ইত্যাদি এখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করেছে যা যোগ্য লোকদের প্রাপ্যতা প্রদানে বিরাট অন্তরায়।

অপরদিকে যে বিষয়গুলো ইতিবাচক তা হলো পেশাগত কর্মকাণ্ড, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উৎপাদনশীল সংগঠন, প্রকাশনা এবং বিচার বিভাগ। সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ যত কম বাঁধাগ্রস্থ হবে, এসব ইতিবাচক দিকগুলো ততই শক্তিশালী ও কার্যকর হবে। বাধা দানকারীরা হল 'মুনকার' এবং বাধাহীন ও ন্যায়ের অবস্থা হচ্ছে 'মারূফ'। এভাবে সমাজে 'মুনকারের পরিবর্তে 'মারূফ' প্রতিষ্ঠা লাভ করলে মুসলিম জাতি আল-কুরআনের ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা লাভে সক্ষম হবে।

NOTES

[1] Gulshani Mahdi "Philosophy of Science : A Qur'anic Perspective." Al Tawhed (Tehran) Vol. II (1) October 1984.
[2] Unus, Iqbal J. *Toward the Assimilation of Islamic Values in Scientific and Technologial Development.* 10th International Conference, Univ. Tech. Malaysia. P. 5, June, 1983.
3Fagirland,I.and Lawrence Saha. Education and National Development. Pergamon press,N.Y.P. 1983.
4Khaldun,Ibn.*the Muqaddimah,* Pantheon Books ; N.Y.? Vol. II p. 426-432. (in Hamdard Library, Karachi, Pakistan).
[5] Ibid, p. 353 and 426.
[6] Ibid, Vol. III, p. 299.
[7] Troll, C.W. *Sayyid Ahmad Khan.* Oxford University Press. p. 17, 1978-79.
[8] Panipati, Mohammad Ismail. *Maqalate Sir Syed.* Majlis Taraqqi Adab, Lahore, Part II, p. 66, 1962.
[9] Sartan, George. *Introduction to History of Science.* Carnegie Institution of Washington_William and Wilkins. Baltimore, 1927.
[10] Boolaky, Ibrahim. "Old Tools of Techniques for a New Development Strategy for The Muslim World." (gives a good account of Muslim heritage concerning development). *Muslim Scientist.* Vol. 10 (2,3) June-Sept. p. 333, 1981.
[11] II. Gibb, H.A.R. *Mohammadanism.* Oxford University Press. p. 61, 1978.
[12] Jansen, G.H. *Militant Islam.* Harper & Row. N.Y. p. 90, 1979.
[13] Haddad, Y.Y. *Contemporary Islam and Challenge of History,* State University, N.Y. Press, Albany, p. 34, 1982.
[14] Smith, D.E. Religion, *Politics and Social Change in Third World.* Free Press N.Y. p. 3, 1971.
[15] Djait, Hichem. *Europe and Islam.* Translated by Peter Heinegg. University of California Press, Berkeley, 1985.
[16] Voll, John Obert, Islam, *Continuity and Change in the Modern World,* Westview Press, p. 34, 1982
[17] Afzal, M. "Problems of Scientific and Technical Education in Muslim Countries." *Muslim Scientist.* Vol. 10, (2,3) June-sept., p. 448, 1981.
[18] Qureshi, I.H. *Lost Opportunities. In Islamic Prespectives,* K. Ahmad and Z.I. Ansari Editors. The Islamic Foundation, U.K. p. 68, 1980.
[19] Khaldun, Ibn. *Moqaddimah,* Vol. II, p. 103.
[20] Zubairi Yameen. *The Purpose of Islam. Byron-Devenport Publishers, U.S.A. p. 66, 1984.*
[21] Brown, L.R. *Building a Sustainable Society. Norton,* N.Y. Chapter 2, 1981.
[22] Brown, L.R. Science 214,.995, 1981
[23] Barr, T.N. *Science* 214, 1087, 1981
[24] Zubairi, M. Yameen "Islamic Treatment of Food and Health" *Muslim Scientist,* U.S.A. II, 56, 1982.
[25] Ratzinger, Cardinal Joseph. "Instruction of Christian Freedom and Liberation Counsels." *Washington Post.* April 5, P.1. 1986.
[26] Zubairi, M. Yameen. *The Purpose of Islam.* Byron Davenport Publishers U.S.A. p. 80. 1984 (part of paper presented as Chairman of Panel of Islamic Revival. Members of Panel included (Late) Ismail al Faruqi of Temple University. A. Said of American University., Z. Wasti of Columbia University, and S.K. Verma of Essex College, 12th Annual Meet. Association of Asian Study. (MAR). University of Pennsylvania, Philadelphia, October 28-30. 1983).
[27] Jahan, Raunaq. Pakistan: Failure in National Integration.Columbia University Press. N.Y. 1972.
[28] Jalibi, Jameel. Pakistani Culture. Mushtaq Book Depo./English Version:Pakistan:The Identity of Culture,1948. Karachi. Pakistan.
[29] Troll, C.W.Sayyid Ahmad Khan.Oxford University Press p.303.1978-79.

[30] Oren, D.A. "Joining the Club." See N.Y. Times.p.B1,March 4, 1986.
[31] Bullock, Alan. The Humanist Tradition in the West.W.W. Norton Co.,N.Y. p.194, 1985.
[32] Zubairi, M.Yameen.(Ed.)Proceedings of Pakistan-American Institute of Science and Technology.University of Maryland.Dr.Abdus Salam Nobel Laureate Chairman. Byron-Davenport Publishers, U.S.A. 1984.

[33] Mawdudi, Syed Abul A'Ala,The Economic Problem of Man and Its Islamic Solution, Islamic Publications, Lahore, P.8,1978 ■

খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞানে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুশীলন

*মোহাম্মদ মাজহার হোসাইনী**

সারসংক্ষেপ

বিষয়টি দু'ভাগে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম ভাগে বিষয়বস্তুর মূল বক্তব্যের উপর একটি নীতিমালা ও দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞানে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলন সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

একজন মুসলিম বিজ্ঞানীর অনুভূতি, চিন্তা ও কর্ম সবকিছুর মধ্যে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্যের মনোভাব প্রকাশ পাওয়া উচিত। আনুগত্যের (এবাদত) বিষয়টি দুভাবে প্রকাশ পেতে পারে- জিকির (সূরা : ৩ : ১৯১) এবং ফিকির (২ : ১৬৪, ৩ : ১৯০)। প্রতিটি অভিজ্ঞতা, ঘটনা ও পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের মধ্যে সার্বভৌমত্বের চিহ্ন ও নিদর্শন খুঁজে পেতে হবে। একটি স্বাধীন ও বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিজ্ঞান ও মানব চিন্তার উন্নতির বিষয়টি দেখতে হবে।

কুরআন ও হাদীসে ইসলামী শিক্ষার যে ধারণা দেয়া হয়েছে তা হেদায়েত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে নিঃসংকোচে ও দ্বিধাহীন চিত্তে, তা বিজ্ঞানসম্মত কিনা সে বিচার করার সুযোগ নেই। কারণ এটা নিশ্চিত যে কুরআনের কোনো শিক্ষাই বিজ্ঞানের বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

আধুনিক শব্দ বা পরিভাষা সমূহে ইসলামের ফলিত বিষয়গুলো স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে হবে।

পুষ্টি বিজ্ঞান ও পুষ্টির ব্যবহারে রয়েছে কুরআন ও হাদীসের দিক নির্দেশনা। মানুষের (মুসলিম) খাদ্য তালিকা প্রণয়ন ও খাদ্যাভ্যাস নির্ণয়ে আলকুরআনের নির্দেশনা ও আল-হাদীসের পরামর্শ এক বিরাট ভূমিকা পালন করে।

কুরআন হাদীসে খাদ্য খাবারের যে দিক নির্দেশনা দেয়া আছে বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ পুষ্টি বিজ্ঞান তাকেই সমর্থন করে ও তার সত্যতা স্বীকার করে। কুরআন হাদীসের নির্দেশনা মোতাবেক খাদ্য গ্রহণ করা হলে একদিকে যেমন আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায়, অন্যদিকে তাতে স্বাস্থ্য রক্ষার অব্যর্থ ফল লাভ হয়। এতে ব্যক্তি, পরিবার ও গোটা সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। আধুনিক খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান যেভাবে রিভিউ করা হচ্ছে তা মূলতঃ ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকেই করা হচ্ছে। খাদ্য বাছাই ও

---

* ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অব দি সিটি অব শিকাগো, ইলিনইস ইউএসএ

তার গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়ের ব্যাপারে এখন মানুষ যথেষ্ট যত্নবান হচ্ছে ও সাবধানতা অবলম্বন করছে। এসবই ইসলামের শিক্ষা। ইসলাম খাদ্য নির্বাচন ও খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছে তা একটা উত্তম ব্যবস্থা যা নিয়ে বর্তমানে রীতিমত গবেষণা হচ্ছে–

১. নীতিমালা ও দিক নির্দেশনা

একজন মুসলিম বিজ্ঞানীর অনুভূতি, চিন্তা ও কর্ম সবকিছুর মধ্যে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্যের মনোভাব প্রকাশ পাওয়া উচিত। আনুগত্যের (এবাদত) বিষয়টি দুভাবে প্রকাশ পেতে পারে- যিকির (৩ : ১৯১) এবং ফিকির (২ : ১৬৪, ৩ : ১৯০)। প্রতিটি অভিজ্ঞতা, ঘটনা ও পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের মধ্যে সার্বভৌমত্বের চিহ্ন ও নিদর্শন খুঁজে পেতে হবে। একটি স্বাধীন ও বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিজ্ঞান ও মানব চিন্তার উন্নতির বিষয়টি দেখতে হবে।

কুরআন ও হাদীসে ইসলামী শিক্ষার যে ধারণা দেয়া হয়েছে তা হেদায়েত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে নিঃসংকোচে ও দ্বিধাহীন চিত্তে, তা বিজ্ঞানসম্মত কিনা সে বিচার করার সুযোগ নেই। তবে এটা নিশ্চিত যে কুরআনের কোনো শিক্ষাই বিজ্ঞানের বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আধুনিক শব্দ বা পরিভাষাসমূহে ইসলামের ফলিত বিষয়গুলো স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও করতে হবে।

২. ঐক্য– বস্তুগত ও আত্মিক

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যত উন্নত হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা, অনুশীলন ও উপদেশসমূহের বাস্তবতা ও উপকারিতা সম্পর্কে বিশ্ববাসী ততই জ্ঞান লাভ করছে এবং এর সত্যতা স্বীকার করছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে বিশ্ব মানব সম্প্রদায় ইসলামকে জানা ও বুঝার পথে বেশী অগ্রসর হচ্ছে। এর ফলে বিশ্ব মানবের মধ্যে একদিন বস্তুগত ও আত্মিক ঐক্য ফিরে আসবে এবং সমাজের মানুষ ভিতর ও বাইর উভয় ক্ষেত্রে অনুভব করবে শান্তির পরশ।

আল-কুরআন ও হাদীসে খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে নীচে তার কয়েকটি পেশ করা হলো :

১. প্রাকৃতিক উপযোগিতা :

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

'পৃথিবীর সবকিছু তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তা সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন, তিনি সকল বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত।' (২ : ২৯)

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ﴾

'আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।' (৪৫ : ১৩)

২. বৈধ খাদ্য :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ﴾

'ওহে মনুষ্যজাতি! ভূমণ্ডলে বিদ্যমান বস্তুগুলো হতে হালাল উত্তম জিনিসগুলো খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, বস্তুতঃ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (২ : ১৬৮)

৩. খাদ্য নির্বাচন

﴿وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيْراً لَّيُضِلُّوْنَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ﴾

'তোমাদের কী হয়েছে যে, যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে তা তোমরা খাবে না? তোমাদের জন্য যা হারাম করা হয়েছে তা তোমাদের জন্য বিশদভাবে বাতলে দেয়া হয়েছে, তবে যদি তোমরা নিরুপায় হও (তবে ততটুকু নিষিদ্ধ বস্তু খেতে পার যাতে প্রাণে বাঁচতে পার), কিন্তু অনেক লোকই অজ্ঞানতাবশতঃ তাদের খেয়াল খুশী দ্বারা অবশ্যই (অন্যদেরকে) পথভ্রষ্ট করে, তোমার প্রতিপালক সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত। (৬ : ১১৯)

৪. পুষ্টিগত মান

﴿فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾

'সে যেন দেখে উত্তম খাবার কোনটি আর তাথেকে তোমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসে' (১৮ : ১৯)

৫. নিষিদ্ধ খাদ্য :

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি হারাম করেছেন মৃত-জীব, রক্ত এবং শূকরের মাংস এবং সেই দ্রব্য যার প্রতি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেয়া হয়েছে, তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে পড়ে কিন্তু সে নাফরমান ও সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার কোন গুনাহ নেই, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।' (২ : ১৭৩)

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতজন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহকৃত পশু, আর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত জন্তু, আঘাতে মৃত জন্তু, উপর থেকে পতনের ফলে মৃত, সংঘর্ষে মৃত আর হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু– তবে জীবিত পেয়ে যা তোমরা যবেহ করতে পেরেছ তা বাদে, আর যা কোন আস্তানায় (বা বেদীতে) যবেহ করা হয়েছে, আর জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা (এগুলো তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে)। এসবগুলো পাপ কাজ। আজ কাফিরগণ তোমাদের দ্বীনের বিরোধিতা করার ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে গেছে, কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, কেবল আমাকেই ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'মাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিলাম। তবে কেউ পাপ করার প্রবণতা ব্যতীত ক্ষুধার জ্বালায় (নিষিদ্ধ বস্তু খেতে) বাধ্য হলে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

'লোকেরা জিজ্ঞেস করছে তাদের জন্য কী কী হালাল করা হয়েছে। বল, যাবতীয় ভাল ও পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, আর শিকারী পশু-পক্ষী– যাদেরকে তোমরা শিক্ষা দিয়েছ যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন– যা তোমাদের জন্য ধরে রাখে তা তোমরা ভক্ষণ করবে আর তাতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করবে, আর আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।' (৫ : (৩) (৪)

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

'যারা ঈমান আনে আর সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা খেয়েছে তার জন্য তাদের উপর কোন পাপ নেই যদি তারা (হারাম থেকে) বিরত থাকে, আর ঈমান আনে. আর সৎকাজ করে, অতঃপর সাবধানতা অবলম্বন করে আর ঈমানের উপর থাকে, অতঃপর আল্লাহকে ভয় করে এবং সৎকাজ করে। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।'

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

'ওহে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন (মুহরিম অবস্থায়) শিকারের ব্যাপারে যা তোমাদের হাত আর বর্শার নাগালের ভিতর এসে যায়, এটা জেনে নেয়ার জন্য যে অদৃশ্যে থেকেও কে আল্লাহকে ভয় করে। (সুস্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে) এরপরও যারা সীমালঙ্ঘন করে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' [৫ : (৯৩), (৯৪)]

৬. ব্যতিক্রম :

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি হারাম করেছেন মৃত-জীব, রক্ত এবং শূকরের মাংস এবং সেই দ্রব্য যার প্রতি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেয়া হয়েছে, তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে পড়ে কিন্তু সে নাফরমান ও সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার কোন গুনাহ নেই, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।' (২ : ১৭৩)

﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

'তারা অবশ্যই কুফরী করেছে যারা বলে আল্লাহ তিন জনের মধ্যে একজন, কারণ এক ইলাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ নেই। তারা যা বলছে তা থেকে তারা যদি

নিবৃত্ত না হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব গ্রাস করবেই।' (২ : ৭৩)

৭. রোজা :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের আগের লোকেদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।' (২ : ১৮৩);

৮. বুকের দুধ খাওয়ানো :

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾

'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদয় আচরণের। তার মা তাকে বহন করেছে কষ্টের সাথে, আর তাকে প্রসব করেছে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস।' (৪৬ : ১৫)

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾

'যে স্তন্য পানকাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু বছর স্তন্য পান করাবে।' (২ : ২৩৩)

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾

'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে, (নির্দেশ দিচ্ছি) যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (তোমাদের সকলের) প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।' (৩১ : ১৪)

৯. কম খাওয়া : *'কম খাও, তুমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে'*- সহীহ হাদীস।

১০. অপচয় পরিহার :

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

'হে আদাম সন্তান! প্রত্যেক সলাতের সময় তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ কর, আর খাও, পান কর কিন্তু অপচয় করো না, অবশ্যই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।'

(৭ : ৩১)

﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى﴾

'তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তাথেকে উত্তমগুলো আহার কর, আর এতে বাড়াবাড়ি করো না, করলে তোমাদের উপর আমার 'আযাব সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর আমার 'আযাব যার উপর সাব্যস্ত হয় সে তো ধ্বংসই হয়ে যায়।' (২০ : ৮১)

১১. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য : নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ, কারণ পচ্ছিন্নতাই ইসলাম– আল হাদীস।

১২. মুখের স্বাস্থ্য : মিসওয়াক।

৩. সুপুষ্টির জন্য উপযুক্ত মানসিকতা ও অভ্যাস

সুপুষ্টি হচ্ছে সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি মূল। পরিমাণমত এবং সঠিক খাবার গ্রহণ করা হলে একদিকে যেমন সুস্থ থাকা সম্ভব, তেমনি স্বাচ্ছন্দে কাজকর্ম করা যায় ও সুখে থাকা যায়। ইসলাম খাদ্য খাবারের যেসব নিয়ম-কানুন বাতলে দিয়েছে সেসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা এবং ব্যক্তি জীবনে তা বাস্তবায়ন করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য অবশ্য করণীয়। মুসলমানদের উচিত পুষ্টি বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়া। পুষ্টি বিজ্ঞানের জ্ঞানে সচেতন হলে একজন মানুষ তার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে ও অপ্রয়োজনীয় খাদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ নিজের, পরিবারের এবং সমাজের সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হয় যখন খাদ্য পুষ্টি সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান থাকে এবং সেগুলো যথারীতি বাস্তবায়ন করা যায়।

ইসলামী শরিয়তে অনুমোদিত খাবার সম্পর্কিত একটি নির্দেশিকা——————

খাদ্য গ্রহণের পূর্বে একজন মুসলমানকে দেখে নেয়া প্রয়োজন যে খাবারটি হালাল না হারাম। হালাল-হারাম বাদ বিচার না করে পেট ও মনের চাহিদা মত খাদ্য গ্রহণ করা কোন মুসলমানের কাজ হতে পারে না। (৬ : ১১৯)

পৃথিবীতে বিরাজমান হাজারও প্রকার খাবার ও পানীয়ের মধ্যে কোনটা হালাল, কোনটা হারাম মুসলমানেরা যাতে তা বুঝতে পারে এবং খাবার নির্বাচনে যত্নবান হতে পারে তার জন্য একটা দিক নির্দেশনা প্রণয়ন করতে হবে। বাজারে যেসব খাবার প্রচলিত আছে সেগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং শিল্পজাত খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে কোন হারাম উপকরণ আছে কিনা সে ব্যাপারে সজাগ হতে হবে।

প্রচলিত খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানের উপর বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা——————

১. প্রচলিত খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান ঐশী নির্দেশনা দ্বারা পরিচালিত নয়।

২. প্রচলিত খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান শুধু মানুষের দৈহিক দিকটি বিবেচনা করে, আত্মিক বিষয়ে এর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।

৩. মানবতার সার্বিক কল্যাণ নয়, বাণিজ্যিক স্বার্থই এর উন্নয়নের পেছনে বেশি প্রেষণা যোগায়।

৪. খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাসের প্রভাব এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে মানুষের আচরণ এর উপর আরো বেশি গবেষণা হওয়া দরকার।

৪. গবেষণার জন্য সুপারিশ

১. শত বছর পূর্বে বিভিন্ন মাযহাবের আলেমগণ হালাল-হারাম সম্পর্কে যে অভিমত প্রদান করেছেন আধুনিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সেগুলো বিশ্লেষণ ও পুনঃ মূল্যায়ন হতে পারে; এক্ষেত্রে ইজতিহাদের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ ইসলামের যবেহ পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার।

(ক) অচেতন করার পদ্ধতি ও তার ফল;

(খ) ব্যথা, নিষ্ঠুরতা, মৃত্যু ইত্যাদি;

(গ) যবেহকৃত জন্তুর রক্ত প্রবাহের ক্ষেত্রে চার প্যাসেজ, তিন প্যাসেজ, দুই প্যাসেজ পৃথক করণের ফলাফল এবং মাংশের গুণগত মান;

(ঘ) পাশ্চাত্যে প্রচলিত যবেহ করার আধুনিক পদ্ধতি ও ইসলামী পদ্ধতির মধ্যে মাংশের গুণগত মান ও রক্ত প্রবাহের ক্ষেত্রে পার্থক্য;

৩. হারাম খাদ্য ও পানীয়ের নেতিবাচক প্রভাবের বিশদ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।

৪. রোযার ক্ষেত্রে দৈহিক (শরীর তত্ত্ব সংক্রান্ত, জীব-রাসায়নিক, ডাক্তারী, রোগ-মুক্তি ইত্যাদি) এবং মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রভাবের উপর গবেষণা।

৫. মধু ও অন্যান্য আল তিব আল নাবাবী এর রোগমুক্তির (শেফা) প্রভাব নিয়ে গবেষণা।

৬. হজ্জ ও ঈদুল আজহার সময় যবেহকৃত পশুর গোশত সংরক্ষণ এবং এগুলোর ১০০% সুষ্ঠু বিতরণের (কোন অপচয় ছাড়া) উপর গবেষণা।

৭. মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম দেশসমূহকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য প্রযুক্তির কৌশল নিয়ে গবেষণা।

৮. স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্ষুধা বিমোচনের যুগোপযোগী ইসলামী সমাধান অন্বেষণ। ■

জ্ঞান প্রকৌশলের ইসলামী প্রেক্ষিত

*এস ইমতিয়াজ আহমদ**

সারসংক্ষেপ

জ্ঞান প্রকৌশলের উপর সম্প্রতিকালে যে উন্নয়ন ঘটেছে তার ইসলামী প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। জ্ঞান প্রকৌশলের ধারণা সম্বলিত ভূমিকা দিয়ে প্রবন্ধ শুরু হয়েছে। জ্ঞান অর্জন বা আহরণের ক্ষেত্রেও একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি রয়েছে যা এ আলোচনায় স্থান পেয়েছে। সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে জ্ঞান-প্রকৌশলের ভূমিকা। মানব মন ও মনন গবেষণার সাথে জ্ঞান প্রকৌশলের সম্পর্কের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে বুদ্ধি বৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। সবশেষে বিষয়টির ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ও সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতির একটা চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. ভূমিকা

জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করা, কোন কিছু নতুন উদ্ভাবন করা ও সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে জ্ঞানকে কিভাবে সংগঠিত করা যায় ইত্যাদি নিয়ে মানুষের মনজগতে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কাজ করে এবং এসব নিয়ে মানব মনে যেসব প্রশ্নের উদ্ভব হয় সেগুলোর জবাব অন্বেষণ করাই এ গবেষণার উদ্দেশ্য। ইসলামের মৌলিক উৎস কুরআন ও রাসূল (ﷺ) এর হাদীস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় জ্ঞান অর্জনের উপর কিভাবে জোর দেয়া হয়েছে এবং সে সাথে যারা জ্ঞানী তাদের মর্যাদার কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে। এসব দেখে সত্যিই আশ্চর্যান্বিত হতে হয় যে, মুসলমানেরা কেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্বে আসতে পারছে না। যাহোক, শুধু এটা ভেবে বসে থাকলে চলবে না, এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার পথ খুঁজতে হবে।

মানুষের সমস্যা সমাধানের বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে গেলে মানব মনের কর্ম কৌশলের নানান দিক বেরিয়ে আসে। সমস্যা সমাধানে কম্পিউটারের অগ্রগতি ও ব্যবহার বিশেষ করে, কৃত্রিম বুদ্ধিভিত্তিক কৌশল ব্যবহার এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এত কিছুর পরও এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এসব কর্মকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যা কিছু পাচ্ছি তা কিন্তু মানব মনের গভীরে লুক্কায়িত বিশাল জগতের সব কিছুকে প্রকাশ করতে পারছে না।

কোন কিছু সম্পর্কে জানলে বা শিখলে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর জন্য প্রয়োজন একটা

---

* ইস্টার্ন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়, ইপসিলানতি, মিশিগান, ইউএসএ

মানসিক প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়া। জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রক্রিয়ার কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। যেমন- বিদ্যমান জ্ঞানের ব্যবহার, নতুন জ্ঞান-অর্জন, নতুন ও পুরাতন জ্ঞান সুসংঘবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা। সংরক্ষিত জ্ঞান পরিবেশের চাহিদায় সাড়া দিয়ে থাকে। মানব মন কিভাবে জ্ঞান সংগঠিত করে সে বিষয়ে চিন্তা করলে দুটো জিনিস সামনে আসে। এক, মানুষের মন যে সকল তথ্য সংগ্রহ করে থাকে তার একটা পরিশীলিত রূপ হলো মনভাণ্ডার। দুই, সংগৃহীত তথ্যের যে বিষয়বস্তু তাও মন ভাণ্ডার ধারণ করে রাখে। কুরআনের প্রধান আলোচ্য বিষয়ও মানব মন। পরিবেশের ঘটনাবলীর সাথে কিভাবে মানব মন সাড়া দিয়ে থাকে বা সাড়া দেয়া উচিত সে বিষয়টাও আল কুরআনে আলোচিত হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় আল কুরআনে যেভাবে বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা এসেছে তা মানব মন ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। যেমন-

- বর্ণনা বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যশীল ও প্রাসঙ্গিক;
- যুক্তির অবতারণা হয়েছে একটা লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে;
- বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে একই বিষয় স্থাপন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও ঘটনাবলীর মাধ্যমে বাণী পৌছানো হয়েছে যেগুলোকে বলা হয় আমছাল (أمثال)।
- সুআচরণ ও তার বিপরীত আচরণের দিক بحيات الفلاح এবং بحيات الخسران আলোচিত হয়েছে।

ফিলিপ সেলঝনিক তার 'লিডারশীপ এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, মানব মনের কথা বা মূল্যবোধ সব সময় আনুষ্ঠানিক লিখিত পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয় না। এগুলো বরং আরো সহজ পদ্ধতিতে মন থেকে মনে সঞ্চালিত হয়। যেমন গল্প, পৌরাণিক কাহিনী, লিজেন্ড, ম্যাটাফোর ইত্যাদি। কোন ঘটনা বর্ণনার স্টাইল মানব মনের উপর যে প্রভাব ফেলে তার ভিত্তিতে এ কথা বলা হয়েছে এবং মানব মন ও প্রকৃতির সাথে তা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

জ্ঞান সম্পর্কে আল কুরআন যে ধারণা দিয়েছে এবং আল-কুরআনে যেসব পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিচে দেয়া হলো :

- সতর্ক হওয়া বা আমল দেয়া
- অন্তর্দৃষ্টি : বাহ্যিক ও আত্মিক।
- ঘটনা ও বিধি-বিধানের কারণ ও যৌক্তিকতা (২৯ : ৪৯)।
- অনুমান ভিত্তিক কথার স্থান না থাকা (৭ : ৭)।
- সত্যকে জানা ও আবিষ্কার করা (২২ : ৫৪)।

কিছু সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে এমন অভিজ্ঞ লোকের জ্ঞান সমৃদ্ধ কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে জ্ঞান প্রকৌশল। ঘটনাবলী থেকে সৃষ্টি হয় উৎসাহ এবং তারপর তাতে সাড়া দেয়ার পালা। প্রথমে ঘটনাটি ভালভাবে চিনতে হবে, অতঃপর সে অনুযায়ী

উপযুক্ত সাড়া দিতে হবে। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় সমস্যা-সমাধান প্রক্রিয়া। সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন এবং সেগুলোর কার্যকর প্রয়োগ। এটাকে বলা যায় লক্ষ্য অন্বেষণ প্রক্রিয়া। ক্ষেত্র ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে থাকলে লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত ক্ষেত্র থেকে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে। বিপরীত ক্রমে লক্ষ্য থেকে ক্ষেত্র পর্যন্ত উল্টোভাবে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। প্রক্রিয়া যেটাই হোক, কাজে এগুতে হলে বিভিন্ন মধ্যবর্তী পর্যায় অতিক্রম করতে হয় এবং এসব পর্যায়সমূহ মিলে একটা চেইন অব থ্যট বা চিন্তার শৃঙ্খল তৈরি হয়। ক্ষেত্র থেকে লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়াকে বলে সম্মুখ শৃঙ্খল বা ফরওয়ার্ড চেইনিং এবং লক্ষ্য থেকে ক্ষেত্রে যাওয়ার অবস্থাকে বলা হয় পশ্চাৎ শৃঙ্খল বা ব্যাকওয়ার্ড চেইনিং। পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে কে কোন্‌টি গ্রহণ করবে। একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা ক্ষেত্রের কোন সমস্যা সমাধানের জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন তা অনেকের মধ্যেই থাকে না অথবা অনেকের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে জ্ঞানের যথাযথ ও ফলপ্রসূ ব্যবহার করতে সমর্থ হয় না। যারা সমর্থ হয় তাদেরকে বলা হয় বিশেষজ্ঞ। একজন মানুষের কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হতে অনেক সময় লাগতে পারে। এমন কি এক-দুই দশকও লেগে যেতে পারে। বিশেষজ্ঞের জ্ঞানকে সরাসরি কাজে লাগানোর পরিসর অনেক সময় সীমিত হয়ে পড়ে। কিভাবে একজন বিশেষজ্ঞ সমস্যা সমাধানে সফল হয়, তা ঠিকমত বুঝতে পারলে তার ব্যাপক ভিত্তিক ব্যবহার সম্ভব হয়। তাছাড়াও, একজন বিশেষজ্ঞের জ্ঞান ঠিকমত কাজে লাগানো সম্ভব হলে এ জ্ঞানের ব্যবহারও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এখন তো যন্ত্রের কার্যক্ষমতাকে ব্যবহার করে বিশাল তথ্য সম্ভার গড়ে তোলা সম্ভব, যখন খুশী এসব তথ্য বের করা যায় এবং বিদ্যুতের গতিতে সেগুলো কাজে লাগানো হয়।

২. জ্ঞান যন্ত্র

পরিচিত পরিবেশ থেকে ঘটনাপ্রবাহ এবং রীতি-নীতি সংগ্রহ ও সংগঠিত করে নতুন পরিবেশের প্রয়োজন অনুযায়ী তা ব্যবহার করার যে কৌশল তাই হল জ্ঞান প্রকৌশল। সঠিকভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারলে জ্ঞান প্রকৌশল দিয়ে জ্ঞানগত সমস্যার সহজ সমাধানে পৌঁছা সম্ভব। ঐতিহ্যগতভাবে মানব মন জ্ঞান যন্ত্র হিসেবে কাজ করে আসছে। এটা একটা উৎপাদনমুখী যন্ত্রের ন্যায় কাজ করে। জ্ঞান যন্ত্রের কাজ হল পরিবেশ থেকে শক্তি সংগ্রহ করা, সঞ্চিত জ্ঞান কাজে লাগাতে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করা, আগত সমস্যার সমাধান করা, এ প্রক্রিয়ায় নতুন জ্ঞান আহরণ করা, বিদ্যমান জ্ঞান সংগঠিত ও হালনাগাদ করা এবং তথ্য উৎপাদন করতঃ নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা।

শিল্প বিপ্লবের পূর্বে মানুষের মধ্যে যান্ত্রিক দক্ষতার হাতিয়ারসমূহ অনুসন্ধান ও কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। শিল্প বিপ্লবের সাথে সাথে মানুষ

পরিচিত হল বাষ্প, বিদ্যুৎ, পানি ও আণবিক শক্তি চালিত ইঞ্জিনের সাথে। এগুলো দিয়ে মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে বস্তুগত পরিবেশে নানান পরিবর্তন আনতে শুরু করে। এসব পরিবর্তন মানুষের জীবন যাত্রার ধরনও রাতারাতি পাল্টে দিতে থাকে। শক্তি চালিত যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে মানুষ শুরু করল বিরাট বিরাট বোঝা উত্তোলন করা, দূর পথ অতিক্রম করা অথবা প্রতিকূল আবহাওয়া মোকাবেলা করা। এ রকম একটা শক্তিশালী যন্ত্র একাই সক্ষম হল হাজার মানুষের কাজ সম্পাদন করতে।

শিল্প বিপ্লবের ফসল শক্তি চালিত যন্ত্র মানুষকে দিল অসাধারণ ও অসামান্য দৈহিক বল। মানুষ এগিয়ে গেল দুর্নিবার গতিতে। যন্ত্রের শক্তি ও কার্যক্ষমতা যত বাড়তে লাগল কর্মক্ষেত্রে ততই মানুষের জায়গা দখল করে নিল যন্ত্র।

জ্ঞান প্রকৌশলও, সাধারণ কথায় যাকে বলা হয় তথ্য যন্ত্র, একইভাবে আরেক ধরনের বিপ্লব সাধন করল। একে বলা যায় তথ্য বিপ্লব। একটা যন্ত্রচালিত মেশিন হাজার লোকের শক্তিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে যে সকল কাজে দৈহিক দক্ষতার প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে, একটা তথ্য যন্ত্র হাজার লোকের মানসিক ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে যে সকল কাজে মানসিক বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন নেই। উপরন্তু, একজন মানুষ তথ্য যন্ত্রকে তার একজন বুদ্ধিমান সহযোগী হিসেবে কাজে লাগিয়ে নিজেকে মানসিকভাবে অধিকতর কর্মক্ষম ও উৎপাদনশীল করে গড়ে তুলতে পারে। যেমনভাবে যন্ত্র চালিত মেশিন দৈহিকভাবে তাকে কার্যক্ষম ও উৎপাদনশীল করতে সাহায্য করে।

৩. মন ও যন্ত্র

মানুষের মধ্যে রয়েছে শক্তি ও গতির মত দৈহিক সত্ত্বা এবং দৃষ্টি, শ্রবণ, স্পর্শ, গন্ধের ন্যায় ইন্দ্রিয় সত্ত্বা। আরো রয়েছে মানসিক শক্তি বা সত্ত্বা। মানসিক ক্ষমতার উদাহরণ হল কোন কিছু দেখে ও শুনে অনুমান করা, তথ্য ও আইন-কানুন দিয়ে যুক্তির অবতারণা করা। স্পর্শ ও গন্ধ এ দুটি ইন্দ্রিয় ক্ষমতাও বক্তব্য তৈরি করতে সক্ষম যা মানসিক ক্ষমতার মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ হয়ে থাকে। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রও মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম। যারা এ যন্ত্র ব্যবহার করে তারা তাদের মানসিক ক্ষমতা বাড়াতে পারে, অধিক উৎপাদনশীল কর্ম সম্পাদন ও সমাজে শক্তি প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এসবের উদাহরণ নীচে ক থেকে ঘ পর্যন্ত উপ অনুচ্ছেদে দেয়া হয়েছে।

তথ্য যন্ত্র তৈরি হয় কম্পিউটার দিয়ে যেখানে থাকে কম্পিউটার, একটা জ্ঞান সমৃদ্ধ ডাটা ও মডেল এবং অপারেশন নিয়ন্ত্রণের কৌশল। অপারেশন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে অবস্থা ও পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ডাটা ও মডেল নির্বাচন ও প্রয়োগ। কোন সন্দেহ নেই যে, তথ্য যন্ত্রকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারলে তা মানবিক উৎপাদনশীলতা

বৃদ্ধিতে কাজে লাগানো যায়। পরিবেশের ঘটনাবলীর প্রতি সাড়া দেয়ার প্রয়োজনে তথ্য সংগঠিত ও সঞ্চিত করার কাজে এ যন্ত্র যেমন সাহায্য করতে পারে, তেমনি অসংখ্য সঞ্চিত তথ্য থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু নির্বাচন করতে এবং মুহূর্তের মধ্যে শতশত পৃষ্ঠার মধ্য হতে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় স্ক্যান করার ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক এ যন্ত্র।

যন্ত্র যেমন মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে, তেমনি এর ক্ষতিকর দিকও আছে। মানসিক কর্মপ্রক্রিয়ার ক্ষমতা যখন বাড়ে তখন তা উপকারে আসে। আবার মানুষের স্বাভাবিক মানসিক তৎপরতা ও প্রক্রিয়াকে যখন যন্ত্র খুব বেশি প্রভাবিত করে ও তার জায়গা দখল করে নেয় তখন তা ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেয়। যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারলে একটি তথ্য যন্ত্র মনের সীমানা পরিবর্ধক হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে। এ যন্ত্রের অসাধারণ ও অসীম ক্ষমতা থাকায় তথ্য প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার উভয়েরই প্রভাব রয়েছে সমাজের উপর যা শিল্প বিপ্লবের চাইতেও সুদূর প্রসারী ও গভীরতর। নিচের উদাহরণগুলো এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যেতে পারে :

ক. জটিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারী বড় বড় কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজন দ্রুত সংগ্রহযোগ্য ও প্রক্রিয়াকরণ যোগ্য ব্যাপক ভিত্তিক তথ্য। এক্ষেত্রে যাদের হাতে তথ্য প্রযুক্তি রয়েছে তারা তাদের প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা সচল ও সতেজ রাখতে পারবে এবং উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হবে। দ্রব্য ও প্রশাসনের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং সম্পদও কম খরচ হবে। প্রতিযোগিদের উপর তারা পরিমাণগত, গুণগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সকল ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে।

খ. দশজন স্থপতি, প্রকৌশলী বা হিসাব বিজ্ঞানী যে কাজ দৈহিক পদ্ধতিতে সম্পাদন করবে সে কাজ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে একজন স্থপতি, প্রকৌশলী বা হিসাব বিজ্ঞানীর পক্ষে আরো অধিক গুণগত মানসম্পন্নভাবে সম্পাদন করা সম্ভব। ফলে অন্য নয়জন যারা বাদ পড়ল তাদেরকে হয় তথ্য প্রযুক্তির সাথে তাল মিলাতে হবে অথবা কর্ম হারাতে হবে।

গ. তথ্য প্রযুক্তিতে যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তাতে পুরানো পদ্ধতি অকেজো হয়ে পড়ছে এবং নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি শেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল এ অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে পারছে না এমন লোকের সংখ্যা অনেক।

ঘ. তথ্য প্রযুক্তির যে সকল বিষয় মানুষের মানসিক ক্ষমতাকে সফলভাবে আয়ত্ব করছে সেগুলো ধীরে ধীরে মানব কর্মক্ষেত্রের অনেকগুলোকেই জয় করে নেবে।

উপরের প্রতিটি উদাহরণ তাদের জন্য কল্যাণের ইঙ্গিত প্রদান করছে যারা সময়মত ও কার্যকরভাবে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করতে সক্ষম। আবার এ একই প্রযুক্তি তাদের জন্য ক্ষতির কারণ, যারা এগুলোর যথাযথ ব্যবহারে অসমর্থ অথবা অনীহা প্রকাশ করবে।

৪. জ্ঞান প্রকৌশল ধারণা

জ্ঞান প্রকৌশলের মূল বস্তু হল তথ্য, তা কাঁচা অথবা পরিশুদ্ধ যাই হোক। বস্তুর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণ সম্বলিত যে চিত্র তাই হল তথ্য। অন্যভাবে বলা যায়, একটা বস্তুকে এর প্রাসঙ্গিক গুণাগুণ সম্বলিত নাম দিয়ে বর্ণনা করা যায়। অন্যদিকে বস্তুর সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা তার মূল্যের গুণাগুণ নির্ধারণ করা হয়। বস্তুর কথা মানে বস্তুর নাম, গুণাগুণ অর্থ গুণবাচক নাম এবং মূল্য অর্থ দৃষ্টান্ত।

এক্ষেত্রে আমরা হাসপাতালে একজন রোগীর উদাহরণ তুলে ধরতে পারি। এখানে বস্তুর একটি টাইপ হল রোগী এবং অন্যটি হাসপাতাল। রোগীর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হতে পারে- রোগীর নাম, বয়স, রোগের লক্ষণ, রোগের ইতিহাস ইত্যাদি। সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্তঃ জন এডামস, ৩৩, জ্বর, শূন্য ইত্যাদি। বস্তুর বৈশিষ্ট্য বাছাই নির্ভর করে কি ধরনের তথ্যের প্রতিফলন প্রয়োজন তার উপর। তাছাড়াও, যে বস্তুটি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে তার প্রায়োগিক প্রয়োজনীয়তা পুরা করার লক্ষ্যে কিভাবে সংশ্লিষ্ট তথ্য সাজানো হবে সে বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুর বর্ণনার ক্ষেত্র কতখানি বিস্তৃত করা হবে তা নির্ভর করছে বস্তুকে আমরা কতটুকু বুঝতে পেরেছি এবং এর প্রয়োগের পরিধি বা ক্ষেত্র সম্পর্কিত আনুমানিক ধারণা এ দু'য়ের উপর। কোন বস্তুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা অর্জন করার প্রক্রিয়াটা কঠিন হতে পারে, বিশেষ করে ঐ বস্তু সম্পর্কে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে। উপরন্তু, একটা বস্তুর টাইপ কিভাবে বর্ণনা করা হবে সে সম্পর্কিত পরিকল্পনা বা লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে সময়ের পরিবর্তন ও সেই সাথে বস্তু সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তনের কারণে অথবা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন সংঘটিত হলে। বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ সংগ্রহের পথ বের করা এবং এসব গুণাগুণের একটি ইতিহাস সংরক্ষণের মাধ্যমে সেগুলোকে হাল নাগাদ রাখার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। ধরা যাক একজন রোগীর বর্তমান কত ওজন তা যেমন জানা প্রয়োজন, তেমনি তার পূর্বের ওজনও জানতে হবে। কারণ সে কি পরিমাণ ওজন হারিয়েছে বা অর্জন করেছে তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কোন বস্তু প্রকৃত অর্থে কি কি বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট তা পুরোপুরি ও সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয় যদি না কেউ সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকে। বস্তু সম্পর্কে পূর্ব জ্ঞান থাকলে এর সঠিক মূল্যায়ন অনেকটা সহজ হয়। আল্লাহ আদম (আঃ) কে জ্ঞান দান করেছিলেন। তাই জ্ঞান প্রকৌশলের সর্বপ্রথম পাঠ বা অধ্যায় আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- *'এবং আদমকে জিনিসের নাম শিক্ষা দেয়া হল।'* (২ : ৩২ - ৩৩)। এ জ্ঞানদান থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জ্ঞানের সিনথেসিস শুরু হল, কৌশল গতিলাভ করল এবং স্বীকৃতি স্থান পেল। এটাই ছিল প্রথম ঘটনা যাতে মানব মন বস্তুর গুণ-বৈশিষ্ট্য বুঝা এবং তার আলোকে সেগুলোর নামকরণ করার কাজে

নিয়োজিত হল। কুরআনে জ্ঞানের বিবরণ, এর নীতিমালা এবং জ্ঞান-প্রকৌশলের হাতিয়ার সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা এসেছে–

- ইল্‌ম– আল-ইয়াকীন (১০২ : ৫) নিশ্চয়তা অথবা যুক্তি ও অনুমান থেকে অর্জিত জ্ঞান।
- আইন– আল-ইয়াকীন (১০২ : ৭), নিশ্চয়তা অথবা দর্শন (ইন্দ্রীয় থেকে অর্জিত জ্ঞান) এবং
- হাক্ক– আল-ইয়াকীন (৬৯ : ৫১), নিশ্চয়তা অথবা যে জ্ঞান পরম সত্য, ইন্দ্রীয়ের সাহায্যে অর্জিত, বা যুক্তি ও অনুমান নির্ভর জ্ঞান দ্বারা যা পরিবর্তনযোগ্য নয়।

প্রথম দু'টি অর্জিত জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত এবং তৃতীয়টি হচ্ছে সেই জ্ঞান যা যুগ যুগ ধরে মানব জাতির কাছে অহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে।

বস্তুর বর্ণনা দিতে হলে বস্তুটি দেখতে কেমন শুধু এতটা বলাই যথেষ্ট নয়। বস্তুটির কি ক্ষমতা আছে ও তার গুণাগুণ কি ইত্যাদিও বলতে হয়। বস্তুকে কোন কোন কাজে ব্যবহার করা যায়, অর্থাৎ এর ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ, বস্তু কি কাজ করতে পারে, এর উৎস কি, সীমাবদ্ধতা কি ইত্যাদি সবকিছুই তার ক্ষমতা বা শক্তির আওতাভুক্ত।

একটা বস্তুকে অনেক বস্তুর সাহায্যে ব্যবহার করা যায় বা গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং ঐ বস্তুটিও অন্যগুলোকে অনরূপভাবে ব্যবহার বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

উপযুক্ত প্রয়োগ পরিবেশে কোন বস্তুকে কেন্দ্র করে কোন ঘটনা সংঘটিত হলে তা থেকে যে ফলাফল ও উত্তর পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে বস্তুর বর্ণনার ব্যপ্তি এবং ক্ষমতা। কোন বস্তুর কার্যকর জ্ঞান প্রকৌশল অর্জনের সাথে উপরিউক্ত সবগুলো বিষয় সম্পর্ক যুক্ত।

জ্ঞানভিত্তিক কাঠামো একটা ইন্টারফেস যা দিয়ে জ্ঞান আহরণে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। এটা জ্ঞানের ভীতকে ক্রিয়াশীল করার একটা ম্যাকানিজম যাতে বিশেষ অথবা সাধারণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কম্পিউটারে রক্ষিত সকল তথ্য সম্পর্কে প্রয়োজনানুসারে জবাব পাওয়া যায়। এসবের সফল ব্যবস্থাপনাই হচ্চে জ্ঞান প্রকৌশলের ফসল। বস্তুর ধারণা, উপকরণ ও বর্ণনা করার কৌশল, যোগাড় ও সংরক্ষণের জন্য বর্ণনার বিন্যাস এবং অপারেশনের ক্রম নির্ধারণ করার পদ্ধতির উন্নয়ন ইত্যাদি হচ্ছে জ্ঞান প্রকৌশলের কাজ। বস্তুর সৃষ্টি, গণনা এবং মুছে ফেলার পদ্ধতি নিয়েও কাজ করে জ্ঞান প্রকৌশল। জ্ঞান প্রকৌশলে লক্ষ্যের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া যেতে পারে :

১. জ্ঞান থেকে বুদ্ধি সৃষ্টি, অর্থাৎ একটা যন্ত্র তৈরি করা যা যুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে একজন দার্শনিকের মত কাজ করবে, ঐতিহাসিক ও সমকালীন ঘটনাবলীর ওপর নতুন অন্তর্দৃষ্টি উপস্থাপন করবে।

২. বস্তুর ভিতরে মন তৈরি করা, অর্থাৎ একটা যন্ত্র তৈরি করা যা স্বাধীন চিন্তার যোগ্যতাসম্পন্ন। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এসব লক্ষ্য নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৫. জ্ঞান প্রকৌশলীর ভূমিকা

একজন জ্ঞান প্রকৌশলীর কাজ হল একটা বিশেষ বস্তু বা অবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরা, অর্থাৎ পৃথিবীতে বিদ্যমান কোন বস্তুর একটি বাস্তব মডেল উপস্থাপন করা। কোন জিনিস বাস্তবে আসলে কেমন সে সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা জ্ঞান প্রকৌশলের কাজ। উপস্থাপিত ধারণার সঙ্গে বাস্তব জগতের ঘটনাবলী ও তার প্রতিক্রিয়ার সঙ্গতি ও সংহতি রক্ষা করতে হবে। একাজ করার জন্য জ্ঞান প্রকৌশলীকে অবশ্যই 'জ্ঞান' বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগের ধরন বুঝতে হবে।

জ্ঞানের মাধ্যম হচ্ছে পর্যবেক্ষণ, যুক্তি প্রয়োগ ও প্রতিফলন। দু'ধরনের জ্ঞান আছে- একসিওমেটিক জ্ঞান ও ইম্পেরিক্যাল জ্ঞান। কোন ঘটনা জানা থাকলে এবং সে সম্পর্কে এক্সিওমেটিক জ্ঞান থাকলে এর নির্দিষ্ট ফল বা প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা সম্ভব। অপরদিকে, ইম্পেরিক্যাল জ্ঞানের কাজ হল পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ। ঘটনা জানা আছে ও সে সম্পর্কে ইম্পেরিক্যাল জ্ঞান আছে- এরূপ ক্ষেত্রে পরীক্ষণের ভিত্তিতে একটি ফলাফল চিন্তা করা যায়।

কোন কিছুকে মডেল হিসাবে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে বিশ্লেষণধর্মী কাজ করার ক্ষেত্রে একজন জ্ঞান প্রকৌশলীকে সকল প্রকার তথ্যের উৎস কাজে লাগাতে হবে যাতে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কোনটা কি তা স্পষ্ট বুঝা যায় এবং এ কাজে অর্জিত জ্ঞানের একটি বিবরণ পেশ করা যায়। সাধারণতঃ জ্ঞান প্রকৌশলী, আলোচ্য ক্ষেত্রে যাকে জ্ঞান বিশ্লেষক বলা যেতে পারে, প্রয়োগ ক্ষেত্রে জ্ঞানের স্রষ্টা বা ব্যবহারকারী নয়। এক্ষেত্রে যারা তার জ্ঞানের স্বীকৃতি প্রদান বা মূল্যায়ন করতে সক্ষম তিনি তাদেরকে রেফার করবেন। এর জন্য প্রয়োজন যন্ত্রপাতি ও যোগাযোগ কৌশল এবং এগুলোর সঠিক ব্যবহার। স্বীকৃতি দানের ব্যবস্থা রাখার উদ্দেশ্য হল প্রয়োগ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা দুর করা এবং মডেল ও বাস্তব চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে জ্ঞান প্রবাহ চালু রাখা।

প্রয়োগের সীমানা বা ক্ষেত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকলে তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পদ্ধতি ব্যর্থ হবে, অথবা খুব সীমিত পরিসরে সফলতার মুখ দেখবে। অবশ্য কোন কোন সময় অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রয়োগ পদ্ধতি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। এ অপূর্ণতা কাটিয়ে ওঠা যায় একটা কৌশল অবলম্বনের দ্বারা যার মাধ্যমে বুঝা যাবে কি ধরনের জ্ঞান সেখানে কাজ করেছে এবং কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়া উৎঘাটনের নিমিত্তে কিভাবে ঐ জ্ঞান কাজে লাগানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করা হয়েছে তার প্রতিক্রিয়ার কার্যকারিতা নির্ণয় করার মত জ্ঞান ব্যবহারকারীর থাকতে হবে। প্রয়োজনে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করতে হবে। অধিকাংশ প্রয়োগ ক্ষেত্র গতিশীল প্রকৃতির অর্থাৎ, কালের পরিবর্তনে উপাত্তের মূল্যও পরিবর্তিত হতে পারে

এবং প্রয়োগযোগ্য নীতিমালাসমূহও পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। সময়ের সাথে কর্মপদ্ধতির তাল মিলানোর ক্ষেত্রে জ্ঞান প্রকৌশলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

জ্ঞান যন্ত্র বা জ্ঞানভিত্তিক যন্ত্রের ব্যবধান ও সময় নির্ণিত হয় এর অভ্যন্তরীণ গঠনাকৃতির বৈশিষ্ট্য দ্বারা। ধরে নেয়া যায় যে এ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হল মানব দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। সুতরাং জ্ঞান প্রকৌশলীর কাজ হচ্ছে ব্যবহারকারী যাতে সিস্টেমের সাথে নিজেকে পরিচিত করে নিতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করা। পারস্পরিক এ পরিচিতির মাধ্যমে ব্যবহারকারীগণের মধ্যে স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। এর ত্রুটির কোন দিক থাকলে তা সিস্টেমের কারণে হতে পারে, অন্য কোন কারণে নয়।

৬. জ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

বাস্তব ঘটনাবলী এবং স্ব-প্রচেষ্টায় কোন কিছু বুঝতে শেখা বা আবিষ্কার করা (হিউরষ্টিকস) এ দু'য়ের মিলিত অবস্থাকে জ্ঞান বলা চলে। বাস্তব ঘটনা হল জ্ঞানের সেই অংশ যেখানে অধিকাংশের অংশ গ্রহণ থাকে, যা জন সাধারণের মধ্যে সহজে পাওয়া যায় এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞগণ যে বিষয়ে একমত পোষণ করে। অপরদিকে, হিউরষ্টিকস হল সেই জ্ঞান যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তি কেন্দ্রিক, আপাত গ্রাহ্য বিধি সম্পর্কিত যা কম আলোচিত, সুবিচার ও যুক্তি গ্রাহ্য অনুমান।

কোন অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা দাঁড় করানোর লক্ষ্যে ঘটনা ও বাস্তবতা সংগ্রহ করা জ্ঞানভিত্তিক সিস্টেম এর কাজ। একজন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক ব্যবহৃত ঘটনা ও বাস্ত বচিত্র সঠিকভাবে অর্জন ও যথাযথভাবে একটা সিস্টেমের মাধ্যমে কাজে লাগাতে পারলে সেই সিস্টেমকে বলা হয় জ্ঞানভিত্তিক বিশেষজ্ঞ পদ্ধতি বা সংক্ষেপে বিশেষজ্ঞ পদ্ধতি।

কম্পিউটেশনাল মডেল ব্যবহারের মাধ্যমে মানসিক শক্তি অধ্যয়ন করা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাজ। মেধা যা করে তা যদি হিসাব পদ্ধতিতে রূপ দেয়া যায় তাহলে কৃত্রিম মেধা সফলভাবে মানুষের মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির ছায়া কপি তৈরী করতে সক্ষম হবে। উদাহরণস্বরূপ, মানসিক শক্তির (দূর দৃষ্টিতে) মডেল ও প্রাকৃতিক ভাষা যান্ত্রিক দূরদৃষ্টি নির্মাণে ও প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণে বিশেষ উপযোগী। শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞদেরই নয়, সকল মানুষের মধ্যেই এসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপকরণ ও কৌশল ব্যবহার করে এবং মানসিক ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে বুদ্ধি বৃত্তিক সিস্টেম গড়ে তোলা হয়।

মানব মন নিয়ে কাজ করা মনস্তত্ত্বের বিষয়। মনস্তত্ত্ব নিয়ে যে কাজ করা যায় তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাজের গতিবিধিকে প্রভাবিত করে থাকে। মানব মন সম্পর্কে মনস্তত্ত্ববিদগণ কি বলতে চায় তা জানা থাকলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ও গতিবিধি

বুঝতে সুবিধে হয়। মনোবিজ্ঞানে প্রদত্ত আচরণবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী সকল আচরণকে ব্যাখ্যা করা যায় বাহ্যিক ঘটনাবলী থেকে আগত উদ্দীপনা ও সাড়া এ দু'য়ের মধ্যে ঘটনা ও ফলাফল (cause and effect) সম্পর্কের আলোকে। এ সম্পর্কটা বুঝা সম্ভব হলে এবং উদ্দীপনা-সাড়া কৌশলের আলোকে তার বিবরণ দেয়া গেলে মানব আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা এবং মানব আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় এ বিষয়ে প্রথম সুনির্দিষ্ট লেখা প্রকাশ করেন ওয়াটসন। তিনি বলেন-

আচরণবিদগণের দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞান হল সম্পূর্ণ বস্তুনিরপেক্ষ ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক শাখা। এর তত্ত্বগত লক্ষ্য হচ্ছে আচরণের ভবিষ্যৎ বাণী ও নিয়ন্ত্রণ। অন্ত ঃদর্শন এ পদ্ধতির কোন অত্যাবশ্যকীয় অংশ নয়। একজন আচরণবাদী জীবের উদ্দীপনা বিষয়ক প্রকল্পে শ্রম নিয়োগের ক্ষেত্রে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য করে না।

আচরণবাদ সকল পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য– আচরণের ক্ষেত্রে এমন কোন তত্ত্ব নেই। তা সত্ত্বেও, আচরণ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে ইহা গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোন কিছু বুঝবার মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া থেকে চিন্তার উদ্রেক হয় অর্থাৎ একটা বাহ্যিক উদ্দীপনাকে ব্যাখ্যা করা হয় চিন্তা প্রক্রিয়ার সাহায্যে। লক্ষ্য, তা থেকে কোন সাড়া পাওয়া। ঘটনা ও ফলাফল সম্পর্ক সকল অবস্থায় সকল মানবীয় আচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কগনিটিভি মনোবিজ্ঞানীগণ এ কারণে মানুষকে অন্যান্য জীব-জানোয়ার থেকে আলাদা করে দেখেছেন। তবে এটা পরিষ্কার নয় যে, কোন কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষমতা (কগনিটিভ মনোবিজ্ঞানীরা যেভাবে দেখে থাকে) কারো কর্মের তথা মুক্ত চিন্তার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনার অনুমতি দেয় কিনা।

নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোকে মানব মনের কগনিটিভ মনস্তত্ত্বের মডেল অংকন করা যেতে পারে :

- মনের মধ্যে রয়েছে কার্যকরভাবে বর্ণনা যোগ্য এক মধ্যস্থতাকারী (যৌগিক আচরণবাদ)।
- মধ্যস্থতাকারীর জন্য মনের একটা কেন্দ্রীয় কৌশল আছে (সেন্ট্রাল কগনিটিভ প্রসেস সাব প্রসেস);
- কেন্দ্রীয় কৌশল আচরণিক বা পেরিফেরাল টার্মে সীমিত করা যাবে না (কনটেমপোরারি কগনিটিভ বিহেভিয়ারিজম, বা ইনফরমেশন প্রসেসিং এপ্রোচ)।

এ মডেলের বিপরীত হচ্ছে মানব মনের ক্লাসিক্যাল রেফারেন্স যাকে বলা হয় ট্যাবুলা রাসা অর্থাৎ মানব মন হল জন্মের সময় শূন্যপাত্র এবং ইন্দ্রীয় অভিজ্ঞতাই একমাত্র জ্ঞানের উৎস।

আল-কুরআনে আল্লাহ্ বলেন,

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾

'যখন আমি তার অবকাঠামো প্রস্তুত সম্পন্ন করিলাম (যথাযথ আকৃতিতে) এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিলাম।' (১৫ : ২৯)

রূহ ফুঁকে দেয়ার অর্থ হল আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছার কিছু অংশ প্রদান করা। সে কারণেই অন্যান্য সৃষ্টির সাথে মানুষের এ পার্থক্য। সুতরাং 'ট্যাবুলা রাসার' (Tabula rasa) ধারণাকে কুরআন অকার্যকর ঘোষণা করছে। কগনিটিভ মনোবিজ্ঞানীগণ মানব মন সম্পর্কে তাদের গবেষণায় এ একই ধারণায় উপনীত হয়েছে বলে মনে হয়। একথাও বলা যেতে পারে যে, ইন্দ্রীয় অভিজ্ঞতা হচ্ছে জ্ঞানের বাহ্যিক উৎস এবং এ জ্ঞান অভ্যন্তরীণভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে, তবে তা সবসময় ভবিষ্যৎ বলার কাজে বা আচরণিক অথবা পেরিফেরাল টার্মে নামিয়ে আনার যোগ্য নয়।

এবি স্কিনার তার 'বিয়ন্ড ফ্রিডম এন্ড ডিগনিটি' গ্রন্থে বলেন *'আমরা হলাম বাহ্যিক জগৎ থেকে প্রাপ্ত উদ্দীপনার ফসল। পরিবেশকে পরিপূর্ণরূপে বুঝ, তাহলে তুমি একজন মানুষের কর্ম বা তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কথা বলতে পারবে'* [১৫]। এ বক্তব্য তখনই সত্য হবে যখন কোন মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত মুক্ত-চিন্তাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ না করে এবং পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে নিজেকেও পাল্টে ফেলে। ব্রুনো বেটল হেইম তার 'অন দি ইউজেস অব এনচান্টমেন্ট' গ্রন্থে মানব মন সম্পর্কে একটি ইতিবাচক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, আমরা যদি জীবনকে খণ্ডিতভাবে না দেখে জীবনের পূর্ণ অস্তিত্বকে সামনে রেখে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখি তাহলে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ও কঠিন কাজ হচ্ছে জীবনের অর্থ খুঁজে বের করা।"

মনস্তত্ত্ব ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্র মিলে ক্রস ফার্টিলাইজেশনের ধারা অব্যাহত রাখে। অবশ্য, মানুষের মন সম্পর্কে মনস্তত্ত্বের তত্ত্বকথার অর্থ এ নয় যে, মন সব সময় সেভাবেই কাজ করে। এ পার্থক্যের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। মানব মনের মডেলে যে যন্ত্র তৈরি হয়েছে তা বুদ্ধিমান আচরণ করবে কিন্তু তা কখনই মানুষের বুদ্ধির ডুপ্লিকেট নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সম্পাদিত কাজ এ দাবি করে না যে, সে যা করবে তা মানুষের কাজেরই ডুব্লিকেট হবে। এর কাজ হবে বুদ্ধি বৃত্তিক আচরণ এবং সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্যে একটা সিস্টেম তৈরী করা যা মানুষের কর্মপদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। তারপরও যন্ত্রের মাধ্যমে যে বুদ্ধিবৃত্তিক আচরণ প্রদর্শিত হয় তার সাথে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের পার্থক্য সুস্পষ্ট এটা বুঝতে হবে। যন্ত্রের ক্রমবিকাশ ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে, আবার একই সাথে মানুষের স্থান যন্ত্রের উর্ধ্বে একথাও স্মরণ রাখতে হবে।

৭. মানব মনের উন্নয়ন

পরিবেশের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক তা ইন্দ্রীয় অনুভূতির মাধ্যমে আমাদের মনের উপর স্থায়ীভাবে রেকর্ড হয়ে যায়। বিখ্যাত গণিতশাস্ত্রবিদ পেনরোজ রজার মন্তব্য করেন, 'বিশ্বটা একটি ভ্রম যা ইন্দ্রীয়সমূহের কারসাজি। মন ইন্দ্রীয়সমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ নানানভাবে সংরক্ষণ করে। নির্দিষ্ট কিছু নিয়মের মাধ্যমে এসব তথ্য বের করে আনা যায়।

যে ভাষায় তথ্যসমূহের আদান-প্রদান হয় সেই ভাষার উপর নির্ভরশীল না হয়েও সংরক্ষিত তথ্য প্রদর্শিত হতে পারে।

ইন্দ্রীয় অনুভূতি সম্পর্কে কুরআন কী বলেছে সেটা দেখা যেতে পারে।

- সেদিন তাদের জবান বন্ধ করিয়া দেয়া হবে কিন্তু তাদের হাত কথা বলবে, পদযুগল সাক্ষ্য দিবে সে সম্পর্কে যাহা তারা করেছে (৩৬ : ৬৫)।
- তাদের চক্ষু ও ত্বক সাক্ষ্য প্রদান করবে (৪১ : ২০)।
- সেদিন তাহাদের জিহ্বা, হস্তদ্বয় এবং পদযুগল সাক্ষ্য দিবে তাদের নিজেদের কাজের বিরুদ্ধে যা তারা করেছে (২৪ : ২৪)।

এভাবে স্পর্শ, স্বাদ ও গন্ধ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় থেকে প্রাপ্ত বার্তা ত্বকের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছে যায়। একইভাবে চোখ প্রেরণ করে দৃষ্টি থেকে এবং কান শ্রবণ থেকে। মন এসব বার্তাকে ডেকে পাঠায় এবং কথ্য ভাষায় সেগুলোকে রূপদান করে। কুরআনে নফস শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা মানব মনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। নিচের উদ্ধৃতিগুলো এক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে :

- কে তোমাদেরকে একই মানুষ হতে সৃষ্টি করেছিল (৪ : ১)।
- আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত ঈমান আনা কারও সাধ্য নেই (১০ : ১০০)।
- শপথ মানুষের (নফস) এবং তাঁহার, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন (৯১ : ৭)।
- তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না (৩০ : ৮)।
- মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্মপ্রবণ (১২ : ৫৩)।
- নিজেকে তিরস্কারকারী আত্মা (৭৫ : ২)।
- প্রশান্ত আত্মা (৮৯ : ২৭)।

কুরআনে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের বর্ণনা মানব মনের উন্নয়নের বিভিন্ন দিকের প্রতি ইঙ্গিত করছে।

৮. জ্ঞান প্রকৌশলের গতিবিধি

পূর্বে জ্ঞান প্রকৌশলের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার ভিত্তিক কাজগুলো স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, উপাত্ত ও হিসাব নিকাশ প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসা প্রশাসনে অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের পরিকল্পিত

প্রতিক্রিয়ার বিবরণও পাওয়া যেত। পূর্বের এ সিস্টেমকে বলা হত ইনফরমেশন প্রসেসিং সিস্টেম, সংক্ষেপে ইনফরমেশন সিস্টেম। ক্রমে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং মানুষের উৎপাদনশীলতায় এর কর্মদক্ষতার ফলে একে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সিস্টেমে উন্নীত করার দিকে মনোনিবেশ করা হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ অবস্থাকে পুরোপুরিভাবে 'কজ এন্ড ইফেক্ট' সম্পর্কের আওতায় ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই উপাত্ত মডেল এবং ইন্টারফেস নিয়ে গঠিত সিস্টেমের মাধ্যমে সামাজিক উদ্দীপনার সমন্বয় ও উৎপাদন করা যায়। মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে এটাকে ব্যবহার করতে পারে। এ সিস্টেমকে বলা হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সিস্টেম। অনেক ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন যুক্তির গ্রহণযোগ্যতা ও সুবুদ্ধির উপর ভিত্তি করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপকরণ ব্যবহার ও বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধকরণে এটি সহায়ক হতে পারে। একটি প্রয়োগ ক্ষেত্রের জন্য বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট এ জ্ঞানভিত্তিক সিস্টেমকে বলা হয় বিশেষজ্ঞ সিস্টেম। উপরে বর্ণিত সকল সিস্টেমকে জ্ঞানভিত্তিক সিস্টেম হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে যা সৃষ্টি করা হয়েছে দক্ষ ব্যবহারকারীদের জন্য।

স্বীকৃতি : লেখক নেজমা নেটালি হিসলারের অবদানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করেছেন যিনি এ উপস্থাপনার বিষয়বস্তু ও ধরন সম্পর্কে অনেক পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

REFERENCES

1. Ahmad, S.I., Basic, M., Dutta, S.P., Lashkari, Ragab, M., Raouf, A., Rénaud, J. and Shklov, N., "Production Reseachers as a Means of Improving Productivity," Proc 1 VIIth. *International conference on Production Research, University of Windsor, Windsor, 2 Vols., 1983.*

2. Charniak, E. And McDermott, D., Artificial Intelligence, Addison-Wesley, 1985.

3. Duda, R.O., Gasching, J.G. and Hart, P.E., "Model Design in the PROSPECTOR Consultant System for Mineral Exploration," D. Michie, (ed.), *Expert Systems in the Microelectronics Age,* Edingburgh University Press, pp 153-167, 1980.

4. Erman, L.D., "Hearsay II Speech Understanding System : Integrating Knowledge to Resolve Uncertainty," *Computing Surveys,* 12(2), pp. 213-253, Feb. 1980.

5. Harmon, P. and King D. Expert Systems, John-Wiley, New York, 1985.

6. Hayes-Roth, F., "Knowledge-Based Expert Systems," Computer, 17(10), pp. 263-273, Oct. 1984.

7. Hayes-Roth, F., Waterman, D. And Lenat, Building Expert Systems, Addison-Wesley, 1983.

8. Hothersal, D., History of Psychology, Random House, NY, 1984.

9. R. Kuppala, "Automatic Laboratory Scale Production Cell with Vision," Proceeding of the 14th International Symposeum on Industrial Robots and the 7th. International Conference on Industrial Robot Techonlogy, Gothenburg, Sweden, pp. 183-188, Oct. 1984.

10. Lindsay, R.K., Buchanan, B.G,. Geigenbaum, E,A., and Lederberg, J. Applications of Artificial Intelligence for Organic Chemistry: The Dendral Projct, McGraw-Hill. 1980.

11. Leigh W.E., Decision Support and Expert Systems, South-Western Publishing Co., Cincinnati, 1986.

12. Martin, W.A. and Fateman, J., "The Macsyma System," Second Symposium, Symbolic and Algebraic Manipulation, pp. 59-75, 1971.

13. McDermott, J., "R1: The Formative Years," AI Magazine, 2(2), pp. 21-29, 1981.

14. Miller, R. People, H., and Myers, J., "Internist-1, An Experimental Computer-Based Diagnostics Consultant for General Internal Medicine" New England Journal of Medicine, 307, pp. 468-476, 1982.

15. Peters, T.J. And Waterman, Jr. R.H.. In Search of Excellence, Warner Books (Harper & Rows), NY, 1982.

16. Raiouf, A. and Ahmad, S.I.,(eds.), Flexible Manufacturing : Recent Developments in FMS, Rototics, CAD/CAM, CIM Elsevier, Amsterdam, 1985.

17. Rogers, H.P. "Helping Machines See," Canadian Datasystems, 18(2), pp. 38-39, February 1986.

18. Waterman, D.A., A Guide to Expert Systems, Addison-Wesley, Reading, 1984.

19. Watson, J.B., "Psychology as The Behaviorist Sees It," Psychological Review, 20, pp. 154-177, 1913.

20. Winston, P.H., Artificial Inelligence, Addison-Wesley, Reading, 1984.

21. Wos, L. Overbeek, R. Lust, E., and Boyle, J., Automated Reasoning, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1984 ■

গণিতশাস্ত্র ও কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষায় ইসলামী বিশ্বাসের ব্যবহার

মুহাম্মদ ইসহাক জাহিদ *

সারসংক্ষেপ

গণিতশাস্ত্র ও কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষায় ইসলামী বিশ্বাস ও মৌলনীতি সমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। প্যাসকল ল্যাংগুয়েজে ব্যবহৃত সিম্বলিক লজিক, ডাটা স্ট্রাকচার ও প্রোগ্রামিং থেকে উদাহরণ নেয়া হয়েছে। সুরা আল আসরকে কেস স্টাডি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। একজন 'মুসলিম বিজ্ঞানী' একই সাথে একেকজন মুসলিম এবং একজন বিজ্ঞানী। এ দুটি পরিচয় পাশাপাশি চলতে হবে। এতে একদিকে, একজন বিজ্ঞানীর ইসলামী পরিচয় ফুটে উঠবে এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে বিজ্ঞান গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের কাজে উৎসাহিত করা হবে, অন্যদিকে ইসলাম ও বিজ্ঞান এই দুয়ের মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক দূরত্বের মধ্যে সমন্বয় ঘটবে। একজন বিজ্ঞানীর ইসলামায়নের জন্য সবচেয়ে প্রথম প্রয়োজন হলো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর পূর্বে প্রয়োজন উপযুক্ত টেক্সট বই। আলোচ্য প্রবন্ধে এসব কাজ কিভাবে সম্পন্ন করা যায় এরই একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভূমিকা

বর্তমান প্রবন্ধে গণিত শাস্ত্র ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্বাস ও মৌলনীতি সমূহের ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্যাসকলের সিম্বলিক লজিক, ডাটা স্ট্রাকচার ও প্রোগামিং এর বিষয়গুলো এখানে বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে। গণিতের প্রত্যেকটি কোর্সে প্রোপজিশন ও ট্রুথ টেবিল একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য। একইভাবে এর হার্ডওয়ার ডিজাইন এর ক্ষেত্রে সিম্বলিক লজিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আধুনিক কম্পিউটার প্রসেসর এর বাইনারী ডিজিটকে বলা হয় বিটস। একটি বিট এর মান হয় শূন্য, না হয় এক।। সিম্বলিক লজিক ও তার প্রয়োগ সাধারণ ডিসক্রিট ম্যাথম্যাটিকস কোর্সের একটা অংশ যা সচরাচর কম্পিউটার বিজ্ঞানের আন্ডার গ্রাজুয়েট কারিকুলামে পড়ানো হয়। কম্পিউটার বিজ্ঞানে প্যাচকল সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এটা ব্যবহৃত হয় প্রাথমিক কোর্স পড়ানোর সময়। কম্পিউটার প্রোগ্রামগুলো বানানো হয়

* গণিত ও কম্পিউটার সাইন্স বিভাগ, দি সিটাডেল, চার্লেসটন, দক্ষিণ ক্যারোলিনা, ইউএসএ।

এলগোরিদমস[১] ও ডাটা স্ট্রাকচার দিয়ে। এলগোরিদমকে দেখা হয় কোন সমস্যার সমাধানের এব্‌স্ট্রাকট হিসেবে। আর কম্পিউটার প্রোগ্রামে ডাটা স্ট্রাকচার এলগোরিদমকে কাজে লাগায়। কম্পিউটার বিজ্ঞানের আন্ডার গ্রাজুয়েট কারিকুলামে ডাটা স্ট্রাকচারের উপর পৃথক কোর্সও পরিচালনা করা হয়।

একজন মুসলমানের প্রাথমিক লক্ষ্য হল মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করা। উদ্দেশ্য এরূপ মহৎ হলে মুসলিম বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সহায়ক হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় একজন মুসলিম বিজ্ঞানী তার জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করে না। তার কাছে এটাও পরিষ্কার নয় যে বিজ্ঞানীও একজন মুসলমান এবং মুসলমান বিজ্ঞানী হিসেবে তার কিছু কর্তব্য রয়েছে। চিন্তার ক্ষেত্রে এ সমস্যার মূল কারণ তার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত। একজন মুসলিম বিজ্ঞানীর শিক্ষা লাভ ঘটেছে পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুটি পরিবেশের মধ্যে। একটি হচ্ছে ইসলাম, অপরটি বিজ্ঞান। এমন একটি পরিবেশ আমাদের সৃষ্টি করতে হবে যেখানে একদিকে বিজ্ঞানীর মুসলিম পরিচয় ফুটে ওঠে অপরদিকে, বৈজ্ঞানিক গবেষণাকর্মে সে অনুপ্রাণিত হয়। ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় আনতে হবে এবং একে অপরের সাথে হাত মিলিয়ে চলতে হবে যাতে প্রত্যেকেই উপকৃত হতে পারে ও শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। আমাদেরকে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যেখানে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীব বিদ্যা, কম্পিউটার বিজ্ঞান, প্রকৌশল, অর্থনীতি এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার পাশাপাশি কুরআন, হাদীস ও শরীয়ত শিক্ষার চর্চা হবে। এর জন্য প্রয়োজন এমন পাঠ্য পুস্তক যেখানে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দানের সময় প্রাসঙ্গিক উদাহরণ আনা হয় বিজ্ঞান থেকে। অনুরূপভাবে, এমন পুস্তক প্রণয়ন করা প্রয়োজন সেখানে বিজ্ঞান পড়ানোর সময় উদাহরণ পেশ করা হবে ইসলামী বিশ্বাস ও মৌল নীতি থেকে। এ প্রবন্ধে গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহে ইসলামের বক্তব্য কি সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। কেস স্টাডি হিসেবে সুরা আল আসরকে গ্রহণ করা হয়েছে।

১. সিম্বলিক লজিক

প্রোপজিশন এমন একটা বাক্য যা সত্যাসত্য নিরূপণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- সত্য অথবা মিথ্যা। প্রোপজিশনের আলোচনা প্রোপজিশনাল ক্যালকুলাস ও ভ্যালুড লজিক এর আওতাভুক্ত। প্রোপজিশন বুঝাতে সিম্বল ব্যবহৃত হয়। প্রোপজিশনের কতিপয়

---

১ পূর্বে এলগোরিদম শব্দটি এলগোরিজম নামে পরিচিত ছিল। বিখ্যাত আরবী বিজ্ঞানী আবূ জাফর মোহাম্মদ ইবন মুসা আল খারেজমী এর নামানুসারে এ শব্দটির নামকরণ হয়েছে। খারেজমী বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়ার খিভা নামক একটি ছোট শহর। আরেকটি শব্দ "এলজেবরা" তার *কিতাব আল- জাবর ওয়াল মুকাবালাহ*" নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে।

উদাহরণ নীচে দেয়া হলো :

ক. খলিল একজন মুসলমান;

খ. ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান;

গ. আমি হজ্জ ও উমরাহ পালন করব (একটা বিশেষ উদাহরণ) অথবা;

ঘ. বৃষ্টি হলে আমি বাড়িতে সালাত আদায় করব।

প্রোপজিশন হিসেবে বিবেচ্য নয় এমন কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ :

ঙ. তুমি কি মসজিদে যাচ্ছ?

চ. একজন মুসলমান প্রতিদিন x বার সালাত আদায় করবে।

কম্পাউন্ড প্রোপজিশন তৈরি করার জন্য আমরা 'নট' 'এন্ড' 'অর' 'ইফ' 'দেন' ইত্যাদি লজিকাল কানেকটিভস ব্যবহার করি। কম্পাউন্ড প্রোপজিশনের ট্রুথ ভ্যালু দেয়া হয় ট্রুথ টেবিল এর মাধ্যমে। নিচের টেবিলে লজিকাল কানেকটিভ 'এবং' দেখানো হয়েছে। $\wedge$ সিম্বলটি ব্যবহৃত হয়েছে 'এবং' নির্দেশ করার জন্য। পি, কিউ দ্বারা প্রোপজিশন দেখানো যেতে পারে।

টেবিল ১

পি	কিউ	পি $\wedge$ কিউ
এফ	এফ	এফ
এফ	টি	এফ
টি	এফ	এফ
টি	টি	টি

টি = ট্রু, এফ = ফলস

অনুরূপভাবে, অন্যান্য লজিকাল কানেকটিভের জন্য ট্রুথ টেবিল দেখানো যেতে পারে। সিম্বল V, > দ্বারা যথাক্রমে 'অর' এবং 'নট' বুঝায়। এসব লজিকাল কানেকটিভ থেকে বিভিন্ন গুণাগুণ পাওয়া যায়। এরূপ একটা গুণ বা বৈশিষ্ট্য হল ডি মরগ্যান'স ল। এটাকে নিম্নরূপভাবে সিম্বলে প্রকাশ করা যেতে পারে :

ডি মরগ্যান'স ল : > (পি ^ কিউ) = > পি = ভি > কিউ। এক কথায়, সংযুক্তির নেগেশন অর্থ নেগেশনগুলোর বিচ্যুতি। এখন সূরা আল আসরের ৪টি শর্তকে নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

ধরা যাক, আই, আর, পি এবং এস নিম্নরূপ প্রোপজিশন।

আই : সে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

আর : সে ন্যায় কাজ করে থাকে।

পি : সে সত্য শিক্ষা দেয়।

এস : সে দৃঢ় এবং সত্যে অবিচল। তাহলে সূরার বক্তব্য অনুযায়ী সফলতা এভাবে দেখানো যায়-

সাকসেস = = আই ^ আর ^ পি ^ এস

ডি মরগ্যান'স ল দ্বারা ব্যর্থতাকে এভাবে প্রকাশ করা যায়-

ব্যর্থতা = সফল নয় = > (আই ^ আর ^ পি ^ এস) = > আই ভি > আর ভি > পি ভি > এস

ট্রুথটেবিলে 'এন্ড' বলে দিচ্ছে যে আমরা সফল, যখন আই, আর, পি এবং এস প্রোপজিশগুলো সত্য। ডি মরগ্যান'স ল এবং 'অর' এর সংজ্ঞা মতে আমরা ব্যর্থ হই যখন আমাদের ৪টি শর্তের কোন একটি মিথ্যে হয়। একটা চিত্রের মাধ্যমে সফলতা ও ব্যর্থতা দেখানো যেতে পারে। ট্রি ১ এরূপ একটা চিত্র। ঐ চিত্রের বামদিকের প্রতিটি শাখা প্রোপজিশনের মিথ্যে ভ্যালুর কথা বলে এবং ডানপাশের প্রতিটি শাখা সত্যের নির্দেশক। কাজেই আমরা দেখতে পাই সফলতা সত্য হয় যখন চারটি শর্তের সবগুলোই সত্য হয়। অন্যান্য ১৫টি কেসের সবগুলোতেই সফলতা হচ্ছে মিথ্যে। সূরায় 'ক্ষতি' (খুসুর) বুঝাতে ব্যর্থতা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

'সে লোক সম্পর্কে বক্তব্য কী যে ইসলাম গ্রহণ করে নাই কিন্তু ভাল কাজ করে, সত্যের কথা বলে এবং চলার পথে দৃঢ়?" এ ধরনের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য চিত্রটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

জবাবে বলা যায় যে সে বিভ্রান্ত, কারণ সবকিছুর মূলে যে জিনিস- বিশ্বাস তার মধ্যে নেই। এও বলা যেতে পারে যে, প্রকৃত অর্থে বিশ্বাসের চাইতে উত্তম কাজ আর কিছু হতে পারে না, ইত্যাদি।

নিচের প্রশ্নের ন্যায় প্রশ্নের জবাবদান সাধারণভাবে কঠিন হতে পারে :

তার সম্পর্কে কী কথা, যার ঈমান আছে এবং সৎ কাজও করে, কিন্তু অন্য দুটি শর্ত অনুপস্থিত?

চিত্রটি পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে এ ধরনের লোক বিভ্রান্ত। অবশ্য সূরাটি সার্বিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আরো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এখানে আমরা সূরাটিকে একটি নতুন আংগিকে উপস্থাপন করতে চাই।

ট্রি-১
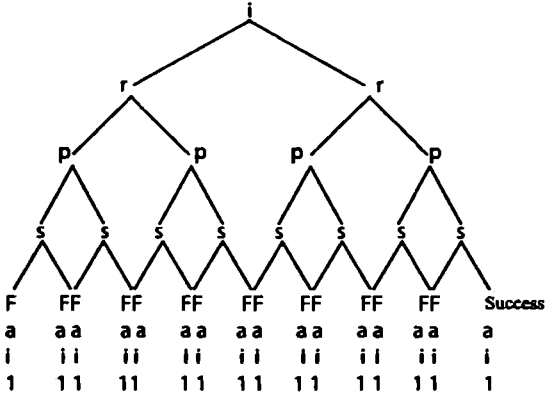
সফলতা ও ব্যর্থতা প্রতিনিধিত্বকারী চিত্র

সূরাটির ৪টি শর্তের বিস্তারিত আলোচনা এভাবে করা যেতে পারে। মুসলিম হিসেবে আমাদের বিশ্বাসের কিছু জটিল বৈশিষ্ট্যকে অতিরিক্ত প্রোপজিশন ব্যবহার করে দেখানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে পূর্বের শব্দকে 'ঃ' প্রোপজিশনাল ভ্যারিয়েবল দ্বারা দেখানো হল। বিশ্বাসের ৫টি বিষয় নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। একটি রেফারেন্স হিসেবে (এম) দ্রষ্টব্য।

আল্লাহ : যে এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করে না।

নবী : যে আল্লাহর নবীর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং মুহাম্মদ (ﷺ) কে তাঁর নবী হিসেবে মানে।

কিতাব : সে সকল আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে এবং কুরআনকে সর্বশেষ আসমানী কিতাব বলে বিশ্বাস করে।

একইভাবে আমরা ফেরেশতা ও পরকাল সম্পর্কে বলতে পারি। তাহলে উপরের প্রোপজিশন 'আই'কে নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

আই = আল্লাহ ^ নবীগণ ^ কিতাব সমূহ ^ ফেরেশতাকুল ^ পরকাল

সুতরাং এক আল্লাহ, নবীগণ ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাসের কনজাংশন হল বিশ্বাস। সৎ কর্মের প্রতীক হিসেবে 'আর' কে নিম্নরূপভাবে আরো বিশ্লেষণ করা যেতে পারে :

আর = সালাত ^ যাকাত ^ সিয়াম ^ হাজ্জ

অবলিগেশনস --টু-- গড ^ অবলিগেশনস--টু--আদার্স

অনুরূপভাবে, দাওয়াতের প্রতীক 'পি' কে নিম্নরূপভাবে দেখানো যায়।

পি = ন্যায় কাজের আদেশ ^ অন্যায়ের প্রতিকার।

এভাবে সফলতার প্রতীকের একটা ক্রমচিত্র অংকন করা যেতে পারে (ট্রি ২)।

ট্রি ২

সফলতার ধাপ

সিম্বলিক লজিক ও ডিসক্রিট ম্যাথমেটিকস (জেড) এর মধ্যে পাওয়া যায়। এখন আমরা প্যাসকল ল্যাংগুয়েজ ও ডাটা স্ট্রাকচারের দিকে মনোযোগ দিতে পারি।

প্যাসকল ও ডাটা স্ট্রাকচার

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রোগ্রামিং ল্যাগুয়েজ হিসেবে প্যাসকলের ব্যবহার ব্যাপক। কম্পিউটার বিজ্ঞানে প্রাথমিক কোর্সসমূহ প্যাসকল প্রোগ্রামিং দিয়ে শুরু করা হয়। ল্যাংগুয়েজের রেফারেন্স হিসেবে (সিসি) দ্রষ্টব্য। প্যাসকলে বুলিন ভ্যারিয়েবল সত্য বা মিথ্যা মূল্যায়নে যথেষ্ট। সুতরাং বুলিন ভ্যারিয়েবলকে প্রোপজিশনের সাথে মিলানো যেতে পারে। সফলতা ও ব্যর্থতাকে তাই বুলিন ভ্যারিয়েবল হিসেবে দেখা যেতে পারে এবং একে নিম্নরূপভাবে লেখা যেতে পারে।

ভ্যারিয়েবল, সাকএসেস, ফেইলিয়র : বুলিন ;

সিম্বলিক লজিকের সাহায্যে সূরা আল আসরের ৪টি শর্ত আরো বিস্তারিত ও ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। ডাটা স্ট্রাকচার ডাটা সংগঠিত করার ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে তথ্যের এবস্ট্রাকট ভিউ এর সাথে সামঞ্জস্য

রেখে যা আমরা কম্পিউটারে দেখতে চাই। প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজগুলো সাধারণত ডাটা স্ট্রাকচার নির্ণয় করার লক্ষ্যে সিনট্যাক্স সরবরাহ করে থাকে। আমাদের প্রথম উদাহরণ একজন মানুষের বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত। প্যাসকলে আমরা সেটাকে এভাবে দেখাতে পারি । দ্বিতীয় বন্ধনীর { } মধ্যে আটকানো কোন কিছু হল সিনট্যাক্স এবং ভ্যারিয়েবল এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাকারী মন্তব্য ।

টাইপ
বিলিফ টাইপ = রেকর্ড
গডস : পূর্ণ সংখ্যা (ইনটিজার) (কত খোদায় তুমি বিশ্বাস কর?)
নবী : (কেউ নেই, একজন, কয়েকজন, সকল);
{তুমি কি সকল নবীর প্রতি বিশ্বাস রাখ?}
ফেরেশতা : বুলিন;
{তুমি কী ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস রাখ?}
কিতাব : (কোনটি না, একটি, কয়েকটি, সকল)
{তুমি কি সকল আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখ?}
পরকাল : বুলিন;
{তুমি কী পরকালে বিশ্বাসী?}
শেষ : (বিলিফ টাইপ)

উপরের ডাটা স্ট্রাকচার থেকে আমরা একটা চিত্র পাই যা নীচের চিত্র ১ এ দেখানো হল।

আল্লাহ	নবীগণ
ফেরেশতাকুল	কিতাবসমূহ
আখিরাত	

চিত্র-১

বিলিফ টাইপের চিত্র

বিলিফ টাইপ সরল ডাটা স্ট্রাকচার রেকর্ডের একটা উদাহরণ যা প্যাসকলে স্টান্ডার্ড হিসেবে বিবেচিত। যদি বিলিফ টাইপে বিলিফকে একটা ভ্যারিয়েবল ধরি, তাহলে তা দিয়ে চিত্র ১ এর সাহায্যে একজন নাস্তিকের বিশ্বাস নিরূপন করতে পারি এবং চিত্র ২(ক) ও (খ) দিয়ে নির্ণয় করা যায় একজন মুসলিমের বিশ্বাস।

প্যাসকল কোডে একজন মুসলমানের বিশ্বাস নিম্নরূপভাবে দেখানো যেতে পারে :
উইথ বিলিফ ডু বিগিন
আল্লাহ : = ১;

নবীগণ : = সকল;
ফেরেশতাকুল : = সত্য;
কিতাবসমূহ : = সকল
আখেরাত : সত্য।
শেষ ;

১	সকল
সত্য	সকল
সত্য	

ক. নাস্তিকের বিশ্বাস খ. মুসলিমের বিশ্বাস

চিত্র ২

কোন ব্যক্তির কর্মও এভাবে দেখানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা নিম্নরূপ প্যাসকল রেকর্ড দেখাতে পারি।
টাইপ
ডিড্স টাইপ = রেকর্ড,
প্রেয়ার্স : ইনটিজার :
(দিস রেকর্ডস দি নাম্বার অব প্রেয়ার্স পারফরম্ড ডিউরিং এ ডে)
জাকাত : বুলিনঃ {ডু ইউ পে যাকাত?}
ফাষ্টিং : বুলিন {ডু ইউ ফাস্ট ইন দি মানথ অব রমাদান?}
হাজ্জ : বুলিন; {হ্যাভ ইউ পারফরমড হাজ্জ?}
অবলিগেশন --টু-- গড
অবলিগেশনস - টু - আদার্স : বুলিন; {ডু ইউ পারফরম্ আদার অবলিগেশন্স টু গড এন্ড ক্রিয়েচার্স?}
এন্ড; {ডিড্সটাইপ}
সূরার অন্য দুটি শর্ত- সত্যের পরামর্শ দান ও ধৈর্য ধারণকে বুলিন ভেরিয়েবল দ্বারা সহজেই দেখানো যেতে পারে। কোন ব্যক্তি এসব শর্ত পালন করে অথবা করে না। সে যদি দুটো শর্ত পালন করে তাহলে তার করেসপন্ডিং ভেরিয়েবল হবে, অন্যথায় ফলস।

৪টি শর্তের সবগুলোকে একত্র করে আমরা সফলতাকে দেখাতে পারি রেকর্ড ও বুলিনের রেকর্ড হিসেবে নিম্নরূপভাবে : প্রথমে রেজাল্টটাইপ এর বিবরণ, তারপর উক্ত টাইপের ভেরিয়েবল হিসেবে সাকসেস ঘোষণা করা।

টাইপ

রেজাল্ট টাইপ = রেকর্ড

বিলিফ : বিলিফ টাইপ'

ডিড্স : ডিড্স টাইপ;

দাওয়াত : বুলিন; {ডু ইউ প্রিচ দ্য ট্রুথ?}

পারজিসটেন্স : বুলিন; {ডু ইউ প্রিচ পারজিসটেন্স}

এন্ড : {রেজাল্ট টাইপ}

ভ্যারিয়েবল সাকসেস : রেজাল্ট টাইপ;

রেকর্ডটাইপস ও ভেরিয়েবলস এর সিনট্যাক্স ব্যাখ্যা করতে উপরোক্ত উদাহরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। স্টেটমেন্ট দিয়ে জেনারালাইজড এর বিশদ আলোচনার জন্য এটা ব্যবহার করা যায়। যেমন- সাকসেস দিয়ে দেখানো যেতে পারে : উইথ সাকসেস, বিলিফ, ডিডস ডু বিগিন।

গডস : = ১;

প্রফেটস : = অল;

এনজেলস : ট্রু

বকুস : = অল

হেয়ার আফটার : = ট্রু;

প্রেয়ার্স : = ৫;

যাকাত : = ট্রু;

ফাষ্টিং = ট্রু;

হাজ্জ : = ট্রু;

অবলিগেশন্স_____ টু ____ গড : = ট্রু;

অবলিগেশন্স_____ টু ____ আদার্স : = ট্রু;

দাওয়াত : = ট্রু;

পারজিসটেন্স : = ট্রু;

এন্ড;

কোন ব্যক্তি যা করছে তাতে তার সফলতা আসবে কিনা তা নির্ণয় করার জন্য প্রোগ্রাম লেখা যেতে পারে। এ প্রোগ্রামের নাম দেয়া যায় ইহতিসাব। এ প্রোগ্রাম ব্যবহারকারীকে দিন শেষে এক গুচ্ছ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে। প্রশ্নের জবাবের ওপর ভিত্তি করে প্রোগ্রাম ব্যবহারকারীকে বলে দেবে তার দিনটি সফল না ব্যর্থ। প্রোগ্রাম এও বলে

দিতে পারে যে ঐ দিন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতা ছিল এবং কিভাবে সেসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠা সম্ভব। আর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই।

উপসংহার

উপরে দেয়া সরল উদাহরণগুলো থেকে সহজেই কতিপয় সিদ্ধান্তে উপণীত হওয়া সম্ভব। পরিশেষ নিচের কথাগুলো বলতে চাই :

১. বিজ্ঞান শেখানোর জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে হলেও পাঠ্য বই প্রণয়ন করা উচিত, যেখানে ইসলামের স্বাদ ও সুগন্ধ থাকবে। এসব পুস্তকের সাহায্যে একজন তরুণ বিজ্ঞানী তার আদর্শ সম্পর্কে একটা ধারণা পাবে এবং বিজ্ঞান অধ্যয়নের সময় স্বাচ্ছন্দ বোধ করবে।

২. সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী অবস্থানে থেকে নতুন আংগিক ও দৃষ্টিভংগিতে ইসলামের শিক্ষা আলোচনার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে যা ইসলামী কনসেপ্ট ও আদর্শ বুঝার ক্ষেত্রে খুব সহায়ক হবে।

৩. এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অধ্যায়নের পাশাপাশি কুরআন, হাদীস, শরীয়াহ ইত্যাদি অধ্যয়নের সুযোগ থাকবে এবং এর মধ্যে থাকবে সুসম্পর্ক ও সুসমন্বয়।

REFERENCES

Cooper, D. and Clancy, M., *Oh Pascal!,* Second Edition, 1985 W.W. Norton & Company, Inc. 500 Fifth Ave., New York, N.Y. 10110, USA.

Mawdudi, Syed Abul A'la, Towards understanging Islam, 1986, ICNA, 166-26, 89th Ave., Jamaica, Queens, N.Y. 11432, USA

Zahid, M.I., Introduction to Discrete Mathematics, 1986, The Citadel Book Store, Charleston, S.C. 29409. USA ■

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান ও ভূ-বিজ্ঞানের ইসলামায়ন

*আদেল এ বকর**

সারসংক্ষেপ

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি শাখা হল ভূ-বিজ্ঞান যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ভূ বা পৃথিবী সম্পর্কিত অধ্যয়ন। ভূ-বিজ্ঞানের একটি অংশ পানি বিজ্ঞান যার সম্পর্ক পানির সাথে। পানিতে যা কিছু ঘটে এবং পৃথিবীর অন্যান্য ক্ষেত্রে এসব ঘটনার যে ভৌত ও রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সে সবই হাইড্রলজি বা পানি বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। পানি বিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বক্তব্য হল পানি যাতে সাগর, বায়ুমণ্ডল এবং ভূমির মধ্যে পানির সঞ্চালন সম্পর্কে নির্দেশনা থাকে। পানি বিজ্ঞানের আরেকটি কাজ হল পানির গতিবিধির পরিমাণ ও হার নির্ণয়ের সঠিক ও বাস্তব পদ্ধতির উন্নয়ন এবং উপাত্ত সংগ্রহ ও বিন্যাস সাধন। সবশেষে পানিচক্র এবং পানির গতিবিধি নিরূপণ ও তার ফলাফল সংক্রান্ত নীতিমালা ও আইন সম্পর্কিত মৌল উপাত্তের উপর ব্যাপক লেখাপড়া করা পানি বিজ্ঞানের আরেকটি কাজ। বিশ্বব্যাপী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিরংকুশ ক্ষমতা ও অসীম শক্তির নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূ-বিজ্ঞান ও পানি বিজ্ঞান কারিকুলামের কোথাও মহান আল্লাহ তা'আলার ঐসব ক্ষমতা ও নিদর্শনের কথা উল্লেখ নেই। তাই বিজ্ঞানে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আনতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ আল কুরআনে আল্লাহ যেসব পথ নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো দিয়ে শুরু করতে হবে।

আলোচ্য প্রবন্ধে আল কুরআনের কিছু কিছু আয়াত উদ্ধৃত করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, ভূ-বিজ্ঞান ও পানি বিজ্ঞান ইসলাম থেকে পৃথক কিছু নয়। পানি চক্রের ধারণা কুরআনেই দেয়া হয়েছে। ভূ-বিজ্ঞান বা পানি বিজ্ঞানে দৃষ্টিভঙ্গির ইসলামায়ন কিভাবে করা সম্ভব সে বিষয়টি বিস্তারিত ও ধাপে ধাপে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং ইসলামায়ন প্রক্রিয়া চালিয়ে নেয়ার একটি সংক্ষিপ্ত কর্মসূচী দেয়া হয়েছে। যে প্রস্তাবনা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে তার জন্য প্রয়োজন ১৫ - ২০ জন পানি বিজ্ঞানীর শ্রম ও প্রচেষ্টা, সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টাফ যারা পাঁচ বছর পর্যন্ত প্রায় সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে কাজ করবে। কাজের জন্য ব্যয় কেমন হবে তা নির্ভর করবে যে দেশে কাজটি করা হবে সেখানকার জীবন যাত্রার মান, বেতন স্কেল ইত্যাদির উপর। তবে বছরে কমপক্ষে ৫০০,০০০ ডলার লাগবে। ইসলাম একটি ব্যাপকভিত্তিক জীবন বিধান। সুতরাং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা মেনে চলার যে গুরুত্ব সে বিষয়ে

---

* প্রেসিডেন্ট ও সিনিয়র হাইড্রোলজিস্ট, আনহার ইন্টারন্যাশনাল কোঃ ডেটন, ওহিও, ইউএসএ।

সবিশেষ জোর দেয়া প্রয়োজন। তাহলে যে কোন পেশার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনে ইসলামায়নের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে।

ভূমিকা :

গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে ভূপৃষ্ঠের তলদেশে পানির গতিবিধি, বিতরণ ও ঘটনা সম্পর্কিত বিজ্ঞান হিসেবে। ভূ-তলদেশের পানির নানা প্রকার ভূ-তাত্ত্বিক ফরমেশন সংঘটিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে একুইফারস সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একুইফার হল এক ধরনের ফরমেশন যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ পারমিয়েবল বস্তু নিহিত থাকে যেখান থেকে কূপ ও ঝর্নায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পানি সরবরাহ করা যায়। পৃথিবীর ব্যবহারযোগ্য নির্মল পানি সম্পদের ৯৫% ভাগেরও বেশি পানি গ্রাউন্ড ওয়াটার থেকে পাওয়া যায়। গ্রাউন্ডওয়াটার নিয়ে অধ্যয়ন করতে হলে ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং গণিত শাস্ত্রের অনেকগুলো মৌল নীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রবাহ (পোরাস মিডিয়ার মাধ্যমে) নির্ভর করে স্তরের (ডিপোজিট) ত্রিমাত্রিক ঘটনাকৃতির ওপর যার মাধ্যমে প্রবাহ সংঘটিত হয়। কাজেই, ভূ-তলদেশ পানি বিজ্ঞানী (গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজিস্ট) অথবা ভূতত্ত্ববিদের ভূ-তাত্ত্বিক উপাত্ত এবং পরিবেশ বিশ্লেষণের উপর অভিজ্ঞতা থাকা জরুরী। গ্রাউন্ড ওয়াটার ছাত্রের জন্য ডিপোজিটের প্রকৃতি ও ভূমি গঠন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, কারণ গ্রাউন্ড ওয়াটার সম্পদ উন্নয়নের একটা বিরাট অংশ ঘটে থাকে নদী, বরফ, বদ্বীপ এবং এওলিয়ান ভূ-তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার কারণে সৃষ্ট অসংহত ভূ-ত্বক ডিপোজিট পরিমণ্ডলে।

ভূতত্ত্ব বিদ্যা থেকে পাওয়া যায় প্রবাহের কাঠামো সংক্রান্ত গুণগত জ্ঞান। আর পরিমাণগত বিশ্লেষণের উপকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ হয় পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র থেকে। গ্রাউন্ডওয়াটার প্রবাহকে তাপ ও বৈদ্যুতিক প্রবাহের সাথে তুলনা করা যায়। গ্রাউন্ডওয়াটার প্রবাহ ফ্লুইড মেকানিকস সূত্র দ্বারা পরিচালিত। পানির সাব সারফেস এলাকার গ্রাউন্ড ওয়াটার এর প্রকৃতিগত রাসায়নিক ক্রমবিকাশ এবং কন্টামিন্যান্টসের আচরণ বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন অজৈব ও ভৌত রসায়নের কতিপয় সূত্রের ব্যবহার। আণবিক রসায়নের সূত্র ও কৌশল অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে সংঘটিত স্থায়ী ও রেডিও একটিভ আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় পানির বয়স নির্ধারণের জন্য।

গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজির একটি প্রধান উপকরণ হল গণিত। গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রবাহের ক্লাসিক্যাল অধ্যয়ন গাণিতিক পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। সেই গাণিতিক পদ্ধতি আবার আগেকার দিনের হাইড্রোলজিষ্টগণ ধার করেছিলেন ফলিত গণিত থেকে। ফলিত গণিতের উন্নয়ন ঘটেছিল মূলত তাপ প্রবাহ, বিদ্যুৎ এবং চুম্বকের সমস্যা নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে। ডিজিটাল কম্পিউটার আবিষ্কার ও তার ব্যাপক ব্যবহারের ফলে

গ্রাউন্ড ওয়াটার সিস্টেমের বিশ্লেষণ সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও সাম্প্রতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে নিউমেরিকাল পদ্ধতিতে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজিষ্টগণ পরিসংখ্যানের দৃষ্টিতে একুইফার প্রপার্টিস এর স্পেশিয়াল ভেরিয়েবিলিটি (spatial variability) বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠেছেন। এতে নতুন তত্ত্বগত মডেলের উন্নয়ন ঘটেছে যার প্যারামিটারকে (একুইফার গুণসম্পন্ন) বিবেচনা করা হয় স্টোকাসটিক ভেরিয়েবল (Stochastic variable) হিসাবে, মহাশূন্যের ডিটারমিনিস্টিক ফাংশন হিসেবে নয়।

১। ভূ-বিজ্ঞান ও পানি বিজ্ঞান (হাইড্রোলজি) সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি :

১৯৮২ সনে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত জ্ঞানের ইসলামায়ন শীর্ষক সম্মেলনের সমাপনী বক্তব্যের সাথে সেখানে উপস্থিত অধিকাংশ পণ্ডিতগণই একমত হন যে, আজকের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ভৌত বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি কোন কিছুতেই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনার স্থান নেই। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হল, যে শিক্ষাবিদগণ ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারতেন তাদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে ইসলামী দূরদৃষ্টির প্রচণ্ড অভাব।

ভূ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, হাইড্রোলজিক সাইকেলের উপাদানসহ ভূ-বিজ্ঞানের অনেক উপকরণের রেফারেন্স রয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে। তা সত্ত্বেও খুব কম মুসলিম ভূ-তত্ত্ববিদই ছাত্রদেরকে এ বিষয়টি পড়ানোর সময় কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার কথা মনে রাখেন। উদাহরণস্বরূপ নিচের আয়াতটির কথা বলা যায়।

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ﴾

'নিশ্চয় আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত ও দিবসের পরিবর্তনে, যা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযান সমূহে, আল্লাহ আকাশ হতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীব জন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।' (২ : ১৬৪)

হাইড্রোলজি অধ্যয়নে হাইড্রোলজিক সাইকেলের জ্ঞান খুব প্রয়োজন কারণ এটা দিয়েই এ বিষয়ের অধ্যয়ন শুরু হয়। হাইড্রোলজিক সাইকেলের প্রকৃতিও বেশ সরল। এ সাইকেলের মাধ্যমে পানি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তাই ভূ-পৃষ্ঠে বা মাটির নিচে শুধু ব্যবহারযোগ্য পানিই প্রবেশ করতে পারে।

এ সকল সাইকেল কিভাবে সংঘটিত হয় সে বিষয়ে আল কুরআনে কী বলা হয়েছে তা দেখা যেতে পারে–

﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ طِبَاقاً – وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً﴾

'তোমরা কি লক্ষ্য করনি আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী? এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোকরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে।' (৭১ : ১৫ - ১৬)

সূর্য থেকে তাপ পেয়ে জমিন ও সাগরের পানি বাষ্পে পরিণত হয় যা বাতাস বহন করে কোথাও যেয়ে বৃষ্টি বা তুষার রূপে পতিত হয় এবং একই প্রক্রিয়ায় পুনরায় সাগর বা ভূমিতে ফিরে আসে।

আল্লাহ বলেন :

﴿اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾

'আল্লাহ, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে এটি মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, অতঃপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন; পরে একে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও তা হতে নির্গত হয় বারিধারা; অতঃপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট ইচ্ছা এটি পৌছে দেন, তখন তারা হয় হর্ষোৎফুল্ল।' (৩০ : ৪৮)

বৃষ্টির পানির একটি অংশ জমা হয়ে সৃষ্টি হয় হ্রদ ও নদী।

আল্লাহ বলেন-

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾

'......তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে।' (১৪ : ৩২)

আল্লাহ আরো বলেন-

﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

'এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্য স্থলে পৌছতে পার।' (১৬ : ১৫)

বিপুল আয়তনের পানি বাষ্প হয়ে বায়ূমণ্ডলে উঠে যায়। ভূ-পৃষ্ঠে যে পানি জমে তার সামান্য কিছু পরিমাণ মাটির স্তরে প্রবেশ করে এবং গাছপালা শোষণ করার পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তা অনুকূল হাইড্রোজিওলজিক অবস্থায় ধীরে ধীরে শোষিত হয়ে 'গ্রাউন্ডওয়াটার' 'রিজার্ভার হিসেবে জমা থাকে।

সূরা মুমিনুন এর ১৮নং আয়াতে আসমানী দয়া ও জ্ঞানের বিষয়ে চিন্তা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾

'আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে; অতঃপর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি; আমি তাকে অপসারিত করতেও সক্ষম।' (২৩ : ১৮)

সূরা হিজর এ আল্লাহ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে পানির মূল উৎসের ওপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। আল্লাহ বলেন :

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾

'আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ূ প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পানি দিয়ে থাকে। আর তোমরা পানি ভাণ্ডারের মালিক নও।'

(১৫ : ২২)

উপরের আয়াতসমূহ হতে বুঝা গেল ভূ-বিজ্ঞান ও হাইড্রোলজি সম্পর্কে বহু আগেই কুরআনে ইংগিত দেয়া হয়েছে। সুতরাং বিজ্ঞানের এসব বিষয় ইসলামায়নের ক্ষেত্রে প্রথমে কুরআনের শিক্ষা দিয়েই শুরু করা যায়। এর জন্য কাংখিত পরিবর্তনের লক্ষ্যে পৌছতে হলে প্রয়োজন বিস্তারিত কর্মসূচি ও পূর্ণ মনোযোগ। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূ-বিজ্ঞান ও পানি বিজ্ঞানের ইসলামায়নের জন্য ধাপে ধাপে যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে :

নীচে যে প্রাথমিক কর্মসূচী দেয়া হল তা ভূ-বিজ্ঞান ও পানি বিজ্ঞানের ইসলামায়নের একটি ছক। কাজ শুরু হয়ে গেলে অন্য বিজ্ঞানীরা এ কর্মসূচী পর্যালোচনা করতে ও এতে পরিবর্তন আনতে পারবে। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ৯টি ধাপ যা নিম্নরূপ–

১. ভূ-বিজ্ঞান ও পানি বিজ্ঞানের ওপর অন্য ভাষায় লিখিত বড় বড় গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় ধারাবাহিকভাবে রূপান্তরের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ কাজের জন্য যে কর্মসূচী ও জনবল প্রয়োজন তারও টেবিল নিচে দেয়া হল।

টেবিল : অনুবাদ কমিটির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ও জনবল :

কাজ	কাজ সম্পাদনের সময়সীমা	জনবল
১। কমিটি গঠন	৬ - ১২ মাস	৩ - ৭
২। রেফারেন্স বই নির্বাচন	৩ - ৬ মাস	৩ - ৭
৩। অনুবাদ পর্যায়	২ - ৫ বছর	১৫ - ৩০
৪। রিভিউ ও সম্পাদনা	১ - ২ বছর	১৫ - ৩০
৫। টাইপ সেটিং ও প্রকাশনা	১ বছর	১০

২. আরবী ভাষার কারিগরি শব্দ সম্ভার গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূ-বিদ্যা ও পানি বিজ্ঞান অভিধান প্রণয়ন ও ইস্যু করা;

৩. ভূ-বিদ্যা ও পানি বিজ্ঞনের ওপর কলেজ ও গ্রাজুয়েট পর্যায়ের পুস্তক প্রণয়ন করতে হবে এবং এ সকল পুস্তকে জ্ঞানের সমন্বয় সম্পর্কে ইসলামে যে ধারণা দেয়া হয়েছে তার ওপর জোর দিতে হবে। ওপরে বর্ণিত দুটি পর্যায়ের পাশাপাশি একই সাথে এটিও করা যেতে পারে।

৪. উপরের তিনটি কাজেই প্রয়োজন উপযুক্ত পরিকল্পনা, কারিগরি বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, সংগঠন, আন্দোলন এবং পর্যাপ্ত তহবিল। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে একটা সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যার ওপর উল্লিখিত দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায়। অতঃপর কিছু কিছু মুসলিম রাষ্ট্রেও এর শাখা স্থাপন করতে হবে।

৫. মুসলমান বিশ্ব ও উত্তর আমেরিকার ভূতত্ত্ববিদ ও পানি বিজ্ঞানীদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। মূলতঃ ইসলামায়নের এ প্রক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করছে নিজ নিজ দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহের এসব পেশাজীবীদের প্রচেষ্টা ও বাস্তব কার্যক্রমের ওপর। মুসলিম বিশ্ব ও যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম ভূ-বিজ্ঞানীদের নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় কর্মসূচী থাকতে হবে এবং এতে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহিত করতে হবে।

৬. যে দায়িত্ব দেয়া হবে তার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য প্রতি দু'বছর পরপর সভার আয়োজন করতে হবে যাতে চূড়ান্ত কর্মসূচি

নিরবচ্ছিন্নভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং এ কাজ করতে যেসব সমস্যার উদ্ভব হবে তার সমাধানের উপায় বের করা যায়।

৭. পুরো কাজের প্রাপ্তি মূল্যায়নের লক্ষ্যে বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং প্রকল্পের অবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ভূ-তত্ত্ববিদ ও **পানি বিজ্ঞানীদেরকে** অবহিত করা।

মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার ব্যতিরেকে শুধু উপরে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলেই কোন পেশার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির ইসলামায়ন সম্ভব নয়। সকল কারিকুলামে ইসলামী চেতনা প্রবেশ করানো ও সমন্বিত শিক্ষা চালু করার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। একই সাথে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, বিভিন্ন পর্যায়ে যারা শিক্ষা দান কাজে নিয়োজিত তারা নিজেরাও একইভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ১৯৮২ সালের ইসলামাবাদ সম্মেলনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয় যা পরিমার্জিত হয়ে নিম্নরূপ কর্মসূচী আকারে তালিকাভুক্ত হয়–

৮. স্কুল ও কলেজ কারিকুলামে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে গ্রহণ করা; অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে ধর্মীয় কোর্সসমূহ গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা (মুসলিম ছাত্রদেরকে তাদের ডিপ্লোমার বছরগুলোতে অর্থাৎ ৬ষ্ঠ গ্রেড, ৯ম গ্রেড ইত্যাদি ধর্মীয় কোর্স পরীক্ষায় পাশ করা প্রয়োজন হয় না)। ক্যারিয়ারের লক্ষ্য যাই হোক, কলেজ ছাত্রদের সকলকেই ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস পড়তে হবে।

৯. মুসলিম দেশ সমূহের স্কুল ও কলেজের বর্তমান কারিকুলামকে একমুখী করা; ধর্মীয় ও সেকুলার শিক্ষা– শিক্ষা ক্ষেত্রে এরূপ অপ্রয়োজনীয় বিভাজন দূর করতে হবে। যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে ইসলামী শিক্ষার চেতনাকে একাত্ম করতে হবে।

২. পানি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি

ওপরের অনুচ্ছেদসমূহে যে কর্মসূচীর কথা বলা হয়েছে সেভাবে নিজেকে প্রশিক্ষিত করেছে এবং গড়ে তুলেছে এমন একজন **পানি বিজ্ঞানীর** নিকট এটাই প্রত্যাশা যে, ইসলামী আইন ও শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী তিনি তার পেশা পরিচালনা করবেন। একজন মুসলিম **পানি বিজ্ঞানীর** দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার জন্য দুটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো :

ক. পানি সম্পদের অভাব

শুষ্ক অঞ্চলসমূহ আজ আগের তুলনায় অনেক বেশি সমস্যা মোকাবেলা করছে। বিশ্বের মরু অঞ্চল সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং খরার প্রভাবে গোটা জাতির অর্থনীতি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ৬ খরা পীড়িত সাহেলিয়ান জাতিসমূহ এর বড়

নজির। তবে শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় শ্রেণীর রাষ্ট্রই এ সমস্যায় আক্রান্ত। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে ও লবণাক্ত পানি উপরে উঠছে।

পানির উৎসের এ সংকট মোকাবেলায় একজন মুসলিম **পানি বিজ্ঞানী** শরীয়তের বিধান মতে তার কাজ পরিচালনা করবেন। কারণ ইসলামী শরীয়ত সবসময় ব্যক্তি স্বার্থ অপেক্ষা জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সুতরাং পানি পাওয়ার হকদার এমন প্রত্যেকের মধ্যে তিনি পানির ন্যায় ভিত্তিক বিতরণ সুপারিশ করবেন। পরকালে তার কাজের জন্য মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে- **পানি বিজ্ঞানীর** এ বিশ্বাসই তাকে তার কাজে ন্যায়পরায়ন ও নিরপেক্ষ থাকতে বাধ্য করবে। **পানি বিজ্ঞানী** ও তার সহযোগিরা তাদের সংশ্লিষ্ট কাজে রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদীস অনুসরণ করবে। ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্সে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। 'ফিক আল সুন্নাহ' থেকে আমরা একটা প্রাসঙ্গিক উদাহরণ তুলে ধরতে পারি। বিখ্যাত এ আরবী রেফারেন্সে এর লেখক বলতে চান যে, একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক কোন ব্যক্তিকে মাটির তলদেশের খনি ও পানিসহ কোন পতিত ভূমি প্রদান করতে পারে- যদি তা ঐ ব্যক্তি ও জাতির উপকারে আসে। তিনি এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীসও উদ্ধৃত করছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন অমুসলিমদের অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালবাসা আরো মজবুত করার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে পতিত জমি বন্টন করেছেন। আবার দেশ ও জাতির প্রয়োজনে তাদের নিকট থেকে কখনও কখনও সেগুলো ফেরতও নিয়েছেন।

জনসংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে পানির চাহিদা অথচ জমিনে পানির উৎস সীমিত। এ পরিস্থিতিতে পানি বিজ্ঞানীগণকে ফকিহদের সহায়তায় মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে পানি আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হবে।

খ. পানি আইন

পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রে পানির উৎস ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয় কিছু কিছু সারফেস ও গ্রাউন্ডওয়াটার আইনের ভিত্তিতে। যুক্তরাষ্ট্রে সারফেস ওয়াটার আইন হচ্ছে স্টেট ও ফেডারেল রেগুলেশনের একটা সমন্বয়, চুক্তি ও আইন। সারফেস ওয়াটার সম্পর্কিত আইন হল মালিকানার রিপেরিয়ান ডকট্রিন যা সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে প্রযোজ্য। আর পশ্চিমাঞ্চালীয় রাজ্যগুলোতে ব্যবহৃত হয় ডকট্রিন অব প্রায়র এপ্রোপ্রিয়েশন। রিপেরিয়ান ডকট্রিনের বক্তব্য হচ্ছে সারফেস ওয়াটার বডির নিকটবর্তী মালিকের পানি আহরণ ও ব্যবহারের প্রথম অধিকার নিকটবর্তী মালিকের। প্রায়র এপ্রোপ্রিয়েশন ডকট্রিন মতে সারফেস ওয়াটার বডির পানি ডাইভার্ট করার ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিই পানির প্রাথমিক অধিকারী। গ্রাউন্ড ওয়াটার ব্যবহার নীতি

পরিচালিত হয় বিভিন্ন ধরনের স্টেট আইনের মাধ্যমে। ইংরেজ আইনে সম্পত্তির মালিকের জমির পানি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পূর্ণ এখতিয়ার আছে। অর্থাৎ জমির মালিক তার জমি থেকে যত খুশি গ্রাউন্ড ওয়াটার তুলতে পারবে তাতে পার্শ্ববর্তী জমির মালিকের ক্ষতি হলেও। অপরদিকে, ১৮৬২ সালে প্রণীত আমেরিকান আইনে জমির মালিক যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার ব্যবহার করতে পারে এবং পার্শ্ববর্তী মালিকের অধিকারকেও তাকে স্বীকার করতে হবে।

মুসলিম পানি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হবে শরীয়তের হুকুম দ্বারা যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি অবশ্যই সম্মান দেখাতে হবে, তবে সরকারী সম্পদের ক্ষতি সাধন করে নয়। সেদিক দিয়ে ইসলামী আইন বৃটিশ আইন অপেক্ষা আমেরিকান আইনের অধিকতর কাছাকাছি। মুসলিম পানি বিজ্ঞানীদের আল্লাহর সেই হুকুমের দিকে খেয়াল রাখতে হবে যা সূরা আরাফ এর ৩১ নং আয়াতে বর্ণিন হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

'খাও ও পান কর কিন্তু অপচয় করিও না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।' (৭ : ৩১)

সমাপনী বক্তব্য

পানিবিজ্ঞান ও এর মূল পদ্ধতি সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে কিভাবে কুরআনে হাইড্রোলজিক পানি চক্রের উপাদান সমূহের বিবরণ দেয়া হয়েছে। আর এ পানি চক্রই হচ্ছে পানি বিজ্ঞান অধ্যয়নের মূল বিষয়। এখানে আমরা দেখাতে চেয়েছি যে, ভূ-বিজ্ঞান ও পানি বিজ্ঞানের বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কে যে বিস্তারিত রেফারেন্স রয়েছে সেগুলো দিয়েই সুন্দরভাবে এ বিজ্ঞানের ইসলামায়নের কাজ শুরু করা যেতে পারে। ইসলামায়ন প্রক্রিয়ার সুফল অর্জন করার জন্য যে বিস্তারিত কর্মসূচী সুপারিশ করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বড় ধরনের পরিকল্পনা, সমন্বয় ও তার অনুসরণ। এ কারণে আমরা প্রস্তাব করেছি বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে শাখা অফিসের ব্যবস্থা রেখে যুক্তরাষ্ট্রে একটি প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সী গড়ে তোলার যে প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইসলামায়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে। এ কাজটি চালানোর জন্য আনুমানিক বাৎসরিক খরচের পরিমাণ হবে ৫০০,০০০ ডলার।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক জীবন ব্যবস্থা। সুতরাং আমাদের চিন্তা-চেতনা ও ব্যবহারিক জীবনের ইসলামায়ন করতে হলে পারিবারিক জীবন, স্কুল-কলেজ, কর্মস্থল তথা সর্বত্রই ইসলামের আলোকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। কুরআন যা বলে

বিজ্ঞানের বাস্তবতায় তার প্রতিফলন ঘটানোর কাজটি একটি বড় কাজ, কিন্তু এর জন্য শিক্ষা কারিকুলামকে ইসলামের নির্যাসে সিক্ত করতে হবে। মুসলিম দেশসমূহের সকল পর্যায়ের শিক্ষাবিদদেরকে অনুরূপভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। মুসলিম বিশ্বে সকলের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য শিক্ষার ঐক্য দীর্ঘ দিনের একটি দাবি। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য মুসলিম পণ্ডিতগণ যে অবদান রেখেছেন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হলে তা থেকে আমরা উপকরণ পেতে পারি। মুসলিম দেশসমূহের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এসব পণ্ডিতগণের জীবনালেখ্য আলোচনা ও তাদের অবদান শিক্ষা দেয়া উচিত।

আমাদের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ও সামাজিক আচার-আচরণকে আলোচনায় আনতে হবে, এর সমালোচনা করতে হবে। যাদেরকে আমরা মুসলিম পণ্ডিত বলে মনে করি তাদের অনেকেই ইসলামী চেতনা বিবর্জিত যা আমাদেরকে মহান আল্লাহর সেই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয় যেখানে আল্লাহ বলেন-

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

'আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না সে জাতি নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়।' (১৩ : ১১)

উম্মাহর এ দুরাবস্থা এটাই প্রথম নয়। উম্মাহর ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যায় গোটা জাতি এবং তার শাসকবর্গ যখন ইসলামের আইন ও নৈতিক শিক্ষার দিকে ফিরে এসেছে তখন বিশ্ব ব্যবস্থায় তারা নেতৃত্বের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾

'যারা ঈমান আনে তাহাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবার সময় কি আসেনি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে?' (৫৭ : ১৬)

সুরা আহযাব এর ২১নং আয়াতটির প্রতি দৃষ্টি দিলে আমাদের সমাজ জীবনের 'ঢিলেঢালা অবস্থাও পরিষ্কার হয়ে উঠে।

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (৩৩ : ২১)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবনের দৃষ্টান্ত গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে। তাহলেই আল্লাহ সুবহানুওয়া তায়ালা আবার মুসলিম উম্মাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির আসনে অধিষ্ঠিত করবেন।

REFERENCES

Al-Arabi, A., 1985, A Review of the Arabic version of: Islamization of Knowledge, by Isma'il Raji al Faruqi, Dar Al-Shuruq, vol. 1, no 3rd, pubilshed by Kuwait's House of Scientific Researches, 1984.
Ali, A.Y., 1977, The Holy Quran, Translation and Commentary, 2nd ed. by American Trust Publications, Originally published in 1934 in Lahore, India.
Bucaille, M., 1978, The Bible, the Quran and Science, English translation by A. D. Pannell and M. Bucialle, North American Trust Publication, Indianapolis, IN, p. 174.
Fetter, C. W., Jr., 1980, Applied Hydrogeology, C. E. Merrill Publishing Co., Columbus, OH, p. 387.
Freeze, R. A., and J.A. Cherry, 1979, Groundwater, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, pp. 10-12.
Leopold, L. B., 1974, Water, a Primer, W. H. Freeman and Co., San Francisco, CA, p. 7.
Linsley, R.K., M.A. Kohler, and J.L.H. Paulhus, 1982, Hydrology for Engineers, McGraw-Hill Book Company, NY, pp. 1-3.
Meinzer, O.E., 1949, "Chapter 1, Introduction, Definition of Hydrology," in Hydrology, O. E. Meiner (ed.), Dover, NY, pp.1-3.
National Academy of Sciences, 1974, "More Watet for Arid Lands," Promising Technologies and Research Opportunities, National Academy of Sciences, Washington, DC, p. 1.
Sabiq, S., 1983, Fiqh Al-Sunnah, 5th ed., Dar al Arabi, Beirut, Lebanon, p. 172.
Todd, D.K., 1980, Groundwater Hydrology, 2nd ed., John Wiley & Sons, NY, p. 25 ■

ভ্রূণ বিদ্যায় দৃষ্টিভঙ্গির ইসলামায়ন

*ইব্রাহীম বি সাঈদ**

সারসংক্ষেপ

ইসলামী সাম্রাজ্যের বিকাশকালে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই মুসলমানদের অবস্থান ছিল সামনের কাতারে এবং জ্ঞানের প্রসারে মুসলমানদের অবদান ছিল অনন্য। মুসলমানদের জ্ঞানের আলোয় আলোকিত না হলে পাশ্চাত্য আজও অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকত। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো মুসলমানেরা ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ায় সভ্যতার সুউচ্চ অবস্থান থেকে আজকের এ দুর্গতির অবস্থানে নেমে এসেছে। ঔপনিবেশিক মন ও ধোলাই করা মগজ নিয়ে আমরা বিজ্ঞান শিক্ষায় অনৈসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মন-মানসিকতা পোষণ করছি। ইসলামী জ্ঞানে অজ্ঞ মুসলিম বিজ্ঞানীরা পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকরণ করছে এবং অমুসলিমদের লেখা বই পড়ছে যারা বিশ্বাসের দিক দিয়ে সেকুলার এবং ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা হিসেবে দেখে থাকে। মুসলমানদের বিশ্বাসের সাথে এটা সাংঘর্ষিক। কারণ ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যেখানে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথকভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের ঐতিহ্য ও গৌরবোজ্জ্বল অতীত ফিরে পেতে হলে বিজ্ঞানের অনুশীলনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি চালু করতে হবে। ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ কোন বিজ্ঞানী মাত্রই এটা স্বীকার করবে যে কুরআন বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। এনাটমি, এস্ট্রোনমি, কুয়ান্টাম ফিজিক্স, জুলজি ইত্যাদি সবকিছুই পরিষ্কার ভাষায় কুরআনে আলোচিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিগ ব্যাং থিওরী, বিবর্তনবাদ, মানব ভ্রুনতত্ত্ব , মহাশূন্য অভিযান এবং আরো অনেক সত্য যা ইতিপূর্বে বিজ্ঞানীদের জানা ছিল না তা কুরআনে বর্তমান।

মুসলিম বিজ্ঞানীগণ যখন কোন প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করবেন তখন কুরআনের সংশ্লিষ্ট কোন আয়াত বা কোন নামকরা মুসলমান বিজ্ঞানীর সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করা উচিত। উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রতিটি অধ্যায়ে কুরআনের আয়াতকে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মূলতঃ কুরআন হল সত্যের সমাহার। তাই ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। যদিও অন্যান্য ধর্মে বিজ্ঞান ও ধর্মের দ্বন্দ্ব একটা অনিবার্য বিষয়। কুরআনে বর্ণিত ওহীর বক্তব্যকে আধুনিক বিজ্ঞান কিভাবে সত্যায়ন করেছে আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক সে বিষয়টি আলোচনা করেছেন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল পর্যায়ে মুসলিম ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তকে কীভাবে ওহীর বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে বিষয়েও আলোকপাত করেছেন।

---

* ইউনির্ভাসিটি অব লুইসভাইল স্কুল অব মেডিসিন, ভি এ মেডিকেল সেন্টার, লুইসভাইল, কেন্টাকি, ইউএসএ।

ভূমিকা :

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ইতিহাসের অধ্যাপক জর্জ সার্টন তার 'দি লাইফ অব সায়েন্স' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, মেসোপোটিয়াম সভ্যতায় বিজ্ঞানের ভীত রচনা করেন তখনকার পণ্ডিতবর্গ, বিজ্ঞানী ও ধর্মগুরুগণ। চিকিৎসা বিজ্ঞান, নেভিগেশন, জ্যোতিষ বিদ্যা, গণিত শাস্ত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা তাদের কাছে ঋণী। দ্বিতীয় পর্যায়ের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে গ্রীকদের দ্বারা যার প্রচলন দেখা যায় পাশ্চাত্যের স্কুল-কলেজে। তৃতীয় পর্যায়ে উন্নয়নের যে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার কৃতিত্ব ইসলামের। আব্বাসীয় খলিফাগণ তখন প্রাচীন পারস্য, হিন্দু, গ্রীক জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে পান করেছে জ্ঞানের সুধা। চারশ' বছর ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানে নেতৃত্ব দিয়েছে ইসলাম। স্পেন ও ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে অতীতে জ্ঞান আদান-প্রদানের ফলে নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে জ্ঞানের মশাল এগিয়ে চলে। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত খৃষ্টীয় শাসন আমলে পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ আরবী গ্রন্থাবলী ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদের কাজে নিয়োজিত ছিল। এভাবে ইসলাম নবজাগরণের পথ বাতলে দিয়েছে যার ধারাবাহিকতায় আধুনিক পাশ্চাত্য বিশ্বে বিজ্ঞানের চতুর্থ অগ্রগতির পর্যায় সূচিত হয়।

উন্নতির সেই শীর্ষ অবস্থান থেকে মুসলিম জাতি আজ সভ্যতার সোপানের সর্বনিম্ন ধাপে ঠাই নিয়েছে। সঙ্গে আছে ঔপনিবেশিক মন-মস্তিষ্ক যা বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অমুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনায় ধোলাই করা। মুসলিম উম্মাহর এ পতন ও বর্তমান অবস্থার কারণ মরহুম ইসমাইল আল রাজি সবিস্তার বর্ণনা করে গেছেন। স্বর্ণোজ্জ্বল অতীত ও ঐতিহ্যকে ফিরে পেতে হলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ইসলামের আদলে রাঙ্গাতে হবে। আল কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ও অনুসন্ধান করার জন্য আল কুরআন বারবার তাগিদ দিয়েছে ও উৎসাহিত করেছে। মানুষের জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব বৈজ্ঞানিক সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে কুরআন সেসব সত্যকে কখনই অস্বীকার করে না। ডঃ মরিস বুকাইলি তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি বাইবেল, দি কুরআন এন্ড সায়েন্স' গ্রন্থে দেখিয়ে দিয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞানের কসমোলজি, ভূ-বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জীব ও উদ্ভিদ জগত, মানব প্রজনন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের সাথে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি কত বেশি সংগতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল। ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগের সেই দৃশ্য ও চেতনার ছাপ মুসলমান বিশ্বের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল পর্যায়ের ছেলেমেয়েদের মন-মস্তিষ্কে এঁকে দিতে হবে। বিজ্ঞানকে এভাবে ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত করার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে এ আলোর বাহক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। এরা বিজ্ঞানকে সামনে এগিয়ে নিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে আগের মত আবার মুসলমানদের পারদর্শিতা ও নেতৃত্ব

প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। এতক্ষণ যে কথা বলা হল অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্বের আসনে মুসলমানদেরকে অধিষ্ঠিত হতে হবে– তা অর্জন করার একটি বাস্তব পদ্ধতি হচ্ছে, মুসলিম পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীগণ যখন কোন বই লেখবেন (অবশ্য এসব লোকদেরকে ইসলামী জ্ঞান ও ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত হতে হবে) তখন প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কুরআনের আয়াত, সহীহ্ হাদীস অথবা কোন বিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী বা পণ্ডিতের লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করতে হবে। যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে কুরআনের আয়াতকে আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞানের আলোকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে। বর্তমান প্রবন্ধে লেখক মানব ভ্রূণ তত্ত্বের ওপর বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান কিভাবে কুরআনের বাণীর সত্যতা মেনে নিয়েছে। লেখক আরো বলতে চেয়েছেন কিভাবে এসব ওহীর বাণীকে মুসলিম ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকে সন্নিবেশ করা যায়। প্রবন্ধটিতে স্বল্প পরিসরে শুধুমাত্র একটি কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে তবে এর প্রতিটি অধ্যায় একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নয়।

১. ওহী নাজিলের পূর্বে ভ্রূণ তত্ত্ব

ভ্রূণতত্ত্বের ওপর প্রথম লেখাপড়া শুরু হয় হিপক্রেটিস (Hippocrates) এর গ্রন্থাবলি দিয়ে (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০ - ৩৭৭)। তিনি মুরগীর ভ্রূণের প্রকৃতি নিয়ে লেখেন। গ্যালেন (দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দ) 'অন দি ফরমেশন অব দি ফিটাস' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন যেখানে প্লাসেন্টা ও মেমব্রেন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মানব শিশুর বিকাশ জরায়ুতে (মাতৃগর্ভ) হয়ে থাকে এ সত্য ১৫শ শতাব্দি পযন্ত অজানা ছিল। জরায়ুতে ভ্রূণের বিকাশ সাধিত হওয়া সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনার সূত্রপাত করেন লিওনার্দ দা ভিঞ্চি। সপ্তদশ শতকের চিকিৎসাবিদগণ জানত না যে, মানব ভ্রূণ ধাপে ধাপে বেড়ে ওঠে। তবে খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ অব্দে এরিস্টটল ভ্রূণের পর্যায়ক্রমিক বিকাশের কথা বর্ণনা করেছেন। পঞ্চদশ শতাব্দির পূর্ব পর্যন্ত মানব ভ্রূণের পর্যায়ক্রমিক বিকাশের বিষয়টি আলোচিত হয়নি। ১৬৭৩ সনে লিউয়েন হুক, যিনি সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন, চিক ভ্রূণের প্রাথমিক ধাপসমূহ বর্ণনা করেন। কিন্তু মানব ভ্রূণের ধাপসমূহের ব্যাপারে ১৯৪১ সন পর্যন্ত কোন কথা শুনা যায়নি।

'মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য মানব ভ্রূণ তত্ত্ব' নামক পাঠ্য বইয়ের ভূমিকা অথবা অধ্যায়-১ এ উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পরে (ঐ পাঠ্য বইয়ের সূচী পত্রের জন্য টেবিল ১ দ্রষ্টব্য)।

অধ্যায় ২ : গর্ভধারণ (Fertilization)

﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾

'অতঃপর তিনি তার বীর্য উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে।'

(৩২ : ৮)

﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾

'মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে?' (৩৬ : ৭৭)

﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

'তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি দান করেন।'

(৩ : ৬, ১৮ : ৩৭, ২২ : ৫)

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾

'আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে, অতঃপর শুক্র বিন্দু হতে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল (পুরুষ ও নারী)' (৩৫ : ১১)

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾

'তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, তারপরে শুক্রবিন্দু হতে, তারপর আলাকা হতে।' (৪০ : ৬৭)

﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَىٰ - ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ﴾

'সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে আলাকায় (লেগে থাকা রক্ত পিণ্ড) পরিণত হয়।' (৭৫ : ৩৭, ৩৮,)

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

'আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য, এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।' (৭৬ : ২)

﴿مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ﴾

'শুক্র বিন্দু হতে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেন, পরে তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন।'

(৮০ : ১৯)

﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ - فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾

'তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন; যেই আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।'

(৮২ : আয়াত ৭, ৮)

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ-خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ-يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾

'মানুষ চিন্তা করুক কী হতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে, এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হতে ।'

(৮৬ : ৫, ৬, ৭)

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً﴾

'আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।' (৭৬ : ২)

শুক্রবিন্দু ও ডিম্বাণুর মিলনের পর পরবর্তী ঘটনা হচ্ছে ফার্টিলাইজেশন যা ঘটে থাকে সাধারণতঃ ইউটেরাইন টিউবের বহির্দেশে। ফার্টিলাইজড ডিম্বাণু পরবর্তী বিভাজনে যাত্রা করে। ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারিত হয় ফার্টিলাইজেসনের সময় যে ধরনের শুক্র এক্স বা ওয়াই ডিম্বাণুকে ফার্টিলাইজ করে তার দ্বারা।

﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى - مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾

'আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল-পুরুষ ও নারী শুক্রবিন্দু হতে, যখন তা স্খলিত হয়।'

(৫৩ : ৪৫, ৪৬)

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

-أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾

'তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন।'

(৪২ : ৪৯, ৫০)

অধ্যায় : ৩ : ইমপ্লান্টেশন

﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ - فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ - إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ - فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾

'আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি? অতঃপর আমি তা রেখেছি নিরাপদ আধারে, এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। অতঃপর আমি একে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমি কত নিপুণ স্রষ্টা।' (৭৭: ২০ - ২৩)

ফাটিলাইজড ডিম্ব বিভিন্ন বিভাজনের মাধ্যমে একটা বলের আকার ধারণ করে থাকে যাকে বলা হয় ব্লাষ্টোসিষ্ট বা ব্লাসটুলা (০.১ মিঃ মিঃ ব্যাসার্ধ)। ব্লাসটুলা ইউটেরাইন টিউব হতে ইউটিরাসে পৌছে যায় এবং এতে সাহায্য করে ইউটেরাইন টিউবের সিলিয়া যা মৃদু ধাক্কা দেয়। ৩ বা ৪ দিনের মধ্যে এ কাজটি সংঘটিত হয়। ব্লাসটুলা দুই দিন মুক্ত ভাবে থাকে, তারপর ইউটেরাইন টিউবে ঝুলতে থাকে ও আটকে যায়। আটকে থাকার সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা হল পোষ্টেরিয়ার ওয়ালের উপরাংশ (চিত্র-১)।

চিত্র-১ : স্ত্রীলোকের তলপেটের সেগিটাল সেকশন ও পেলভিস এর চিত্র যেখানে জরায়ুতে ভ্রূণ দেখানো হয়েছে। 'অন্ধকারের পর্দা' হল (১) ইনটেরিয়র এবডোমিনাল ওয়াল বা মাতৃজঠর; (২) দি ইউটেরাইন ওয়াল বা জরায়ু এবং (৩) দি এমনিও কোরিওনিক মেমব্রেন বা ঝিল্লি আচ্ছাদন।

ইবনে হাজার আল আসকালানী তার সহীহ আল বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুলবারীতে উল্লেখ করেছেন যে, শুক্র গর্ভে প্রবেশ করার পর গর্ভের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পূর্বে ৬ দিন থাকে। তিনি ইবনে আল কাইয়েম (১৩শ শতাব্দী) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বলেন, *'শুক্র গর্ভে প্রবেশ করে একটি বল সদৃশ আকৃতি গ্রহণ করে এবং এটা নিজে নিজে গর্ভে সংযুক্ত হবার পূর্বে ৬ দিন থাকে।'*

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾

'অতঃপর আমি তাকে শুক্র বিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে।

(২৩ : : ১৩)

উপরের আয়াতে শুক্রবিন্দু বা নুত্ফা বলতে মুরের মতে জায়গোটকে বুঝানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন এ ব্যাখ্যার সমর্থনে কুরআনের আরেকটি আয়াত আছে যেখানে বলা হয়েছে *'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মিশ্রিত পানির বিন্দু দ্বারা।'* এখানে মিশ্রিত পানি বিন্দু বলতে জাইগোটকে বুঝানো হয়েছে যা সৃষ্টি হয় শুক্র ও ডিম্বাণুর মিশ্রণ দিয়ে। জাইগোট ভেঙ্গে যেয়ে ব্লাস্টোসিষ্ট তৈরি করে যা জরায়ুতে (বিশ্রামের স্থান) আটকে থাকে।

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾

'সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে।' (৯৬ : ২)

মুর বলেন, আটকে থাকা ব্লাষ্টোসিষ্ট বা স্বতস্ফূর্তভাবে পরিত্যাক্ত কনসেপটাস দেখতে জমাট বাধা রক্তের ন্যায়।

অধ্যায় ৪ : ট্রিলামিনার ভ্রূণ।

﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ﴾

'তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।' (৩৯ : ৬)

আগেই বলা হয়েছে ১৯৪১ সালের পূর্ব পর্যন্ত মানব ভ্রূণের পর্যায়গুলো আলোচিত হয় নাই।

তাফসীরকারগণ অন্ধকারের ত্রিবিধ অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন : ১. মাতৃজঠর, ২. জরায়ু ও ৩. ঝিল্লির আচ্ছাদন (চিত্র -১)।

এ ব্যাপারে আলবার একটি সুন্দর পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করে বলেন, এ তিনটি স্তর আবার অপর তিনটি স্তর দিয়ে গঠিত। এবডোমিনাল ওয়াল তথা মাতৃজঠর গঠিত হয়েছে মাংশ পেশীর বহিঃস্থ তীর্যক শীট দ্বারা যার পরে রয়েছে অন্তস্থ তীর্যক পেশী এবং এরপর রয়েছে ট্রান্সভার্সাস পেশী।

জরায়ুর দেয়াল গঠিত হয়েছে এপিমেট্রিয়াম, মাইওমেট্রিয়াম এবং এনডোমেট্রিয়াম দ্বারা।

ভ্রূণের চতুর্দিকে অবস্থিত স্যাক বা অভ্যন্তরীণ স্তর গঠিত হয় এমনিয়ন, করিয়ন এবং ডিসিডুয়া দ্বারা। ডিসিডুয়া বা প্লাসেন্ট এনডোমিট্রাম প্লাসেন্টা গঠনে কোন ভূমিকা রাখে না। এ মেমব্রেন বা পর্দা প্রসবকালে পড়ে যায়। সেজন্য একে বলা হয় ডিসিডুয়া অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী, স্থায়ী নয়। এ অংশটা মাসিক বা প্রসবকালে পড়ে যায়।

অধ্যায় ৫ : এমব্রায়োনিক পিরিয়ড

﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا
ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾

'পরে আমি শুক্র বিন্দুকে পরিণত করি 'আলাক' এ। অতঃপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ড এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি পঞ্জরে; অতঃপর অস্থি পঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা; অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে।' (২৩ : ১৪)

কুরআনে বর্ণিত 'আলাক' কথাটির দুটি অর্থ আছে। একটি অর্থ হল কোন কিছুর সাথে লেগে থাকা বা সংযুক্ত থাকা। এনডোমিট্রিয়াম স্তরে ব্লাষ্টোসিষ্ট এর লেগে থাকা, সংযুক্তি এবং বেড়ে উঠা প্রক্রিয়া বুঝাতে এ অর্থ ব্যবহৃত হয়। এ আশ্চর্যজনক প্রক্রিয়া ১৪শ বছর আগে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন যার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ এ সম্পর্কে কিছুই জানত না।

'আলাক' এর দ্বিতীয় অর্থ হল জোঁক বা রক্ত চোষা। মানব ভ্রূণ জরায়ুর এনডোমিট্রিয়ামে লেগে থাকে যেভাবে জোঁক ত্বকের সাথে লেগে থাকে। অনুরূপভাবে জোঁক যেমন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শরীর থেকে রক্ত চুষে নেয় তেমনি মানব ভ্রূণ চুষে নেয় রক্ত (পুষ্টি) ডিসিডুয়া বা গর্ভবতী এনডোমিট্রিয়াম হতে। ২নং চিত্রে একটি ২৩-২৪ দিনের ভ্রূণ ও জোঁকের মধ্যকার উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। সপ্তম শতকে কুরআন নাজিলের সময় চিকিৎসকগণ মানব ভ্রূণের সাথে জোঁকের এ অদ্ভুত সাদৃশ্যের কথা ভাবতেও পারেনি। তারা এ বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে পারেনি কারণ, তখন কোনো লেন্স বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না।

চিত্র :
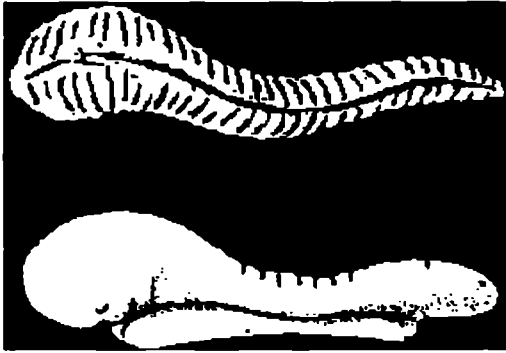
চিত্র-২ : উপরে, একটি জোক বা রক্ত চোষার ছবি, নীচে ২৪ দিনের একটি মানব ভ্রূণের ছবি। এ পর্যায়ে মানব ভ্রূণের আকৃতি জোকের সদৃশ্য যা লক্ষ্য করার মত।

﴿فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً﴾

'অতঃপর 'আলাক' কে পরিণত করি পিণ্ডে (মুদগাহ)। (২৩ : ১৪)

আরবী মুদাগাহ শব্দের অর্থ চর্বিত বস্তু বা চর্বিত পিণ্ড। ৪ সপ্তাহের একটি মানব ভ্রূণের প্রতি লক্ষ্য করলে সেটা দেখা যাবে একটা চর্বিত গোশতের পিণ্ডের ন্যায়। (চিত্র- ৩)। চর্বিত বস্তুটি তৈরি হয় সোমাইটস থেকে যা দাঁতের দাগের মত দেখায়। সোমাইটস থেকেই মূলতঃ এক্সিয়াল অস্থির বৃহৎ অংশ এবং পেশীর বিকাশ সাধিত হয়।

চিত্র-৩

চিত্র-৩ : বায়ে-মানব ভ্রূণের প্লাস্টিক মডেল যা দেখতে চর্বিত গোশতের মত। ডানে ২৮ দিনের ভ্রূণ।

﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾

'এবং গোশত পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে; অতঃপর অস্থি পঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা।' (২৩ : ১৪)

পেশীর আগে গঠিত হয় অস্থি। ভার্টিব্রাল কলাম ও লিম্ব বোন উভয়ের ক্ষেত্রেই এটা সত্য। অবিশ্বাস্য মনে হলেও ভ্রূণতাত্ত্বিক বিকাশের ধারা অনুযায়ী এটা হয়ে থাকে। প্রথমে কার্টিলেজ মডেল অনুযায়ী অস্থি গঠিত হয়। পরে তার চারপাশে সোমাটিক মেসোডার্ন থেকে পেশী (গোশ্‌ত) গড়ে ওঠে।

﴿ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾

'তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশ্‌ত পিণ্ড হইতে। (২২ : ৫)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় ভ্রূণ তৈরি হয় পূর্ণাকৃতি এবং অপূর্ণাকৃতি টিসু দ্বারা।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তরুণাস্থি যখন পূর্ণাকৃতি হয়, ভ্রূণ সংযোগ টিস্যু বা এর চারপাশের মেছেন চাইম তখন অপূর্ণাকৃতির থাকে যা পরে পূর্ণতা লাভ করে পেশী ও অস্থির সাথে সংযুক্ত লিগামেন্ট এ পরিণত হয়। সূরা মুমিনুন এর ১৪নং আয়াতের শেষাংশে এভাবে বলা হয়েছে- "অবশেষে আমরা গড়িয়া তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে।" বিবর্তনবাদের একটা যুক্তি হল মানুষ ও পশুর ভ্রূণ দেখতে একইরকম। সুতরাং মানুষের উদ্ভব পশু থেকেই। অথচ উপরে উদ্ধৃত আয়াতে দেখা যাচ্ছে অন্য এক সৃষ্টি বলতে যা বুঝানো হয়েছে তার গঠন হচ্ছে অস্থি ও পেশী থেকে। এটা দিয়ে মানুষ ভ্রূণের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যা গঠিত হয় অষ্টম সপ্তাহের শেষ দিকে। এ পর্যায়ে এর মধ্যে সুস্পষ্ট মানব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় এবং এতে দেহের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ সকল অঙ্গের প্রাথমিক লক্ষণ নিহিত থাকে। আট সপ্তাহ পূর্ণ হওয়ার পর মানব ভ্রূণের পরবর্তী স্তরকে বলা হয় ফীটাস। এটাকেই হয়ত কুরআনে নতুন সৃষ্টি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾

'এবং তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ।' (৩২ : : ৯)

এ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি, কিভাবে মহান প্রভু শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, অনুভূতি বা বোধশক্তি দিয়েছেন। ভ্রূণতত্ত্ববিদগণও স্বীকার করেন বিশেষ ইন্দ্রীয়গুলো আসলে ঠিক এভাবেই বিকাশ লাভ করে। মুর স্বীকার করেছেন যে, শ্রবণ যন্ত্রের অভ্যন্তরীণ প্রাথমিক গঠন শুরু হয় দৃষ্টি যন্ত্রের পূর্বে এবং বোধশক্তির আধার মস্তিষ্ক পূর্ণতা লাভ করে সবার শেষে। বর্ণিত পাঠ্য বইয়ের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের (যথাক্রমে অস্থি ও পেশী সিস্টেম) শুরুতে সুরা মু'মিনুন এর ১৪নং আয়াতটি সন্নিবেশ করা যেতে পারে।

অধ্যায় : ১৯ : পূর্ণ মেয়াদ

﴿وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ﴾

'আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি।'

(২২ : ৫)

﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ - فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾

'যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস করেছেন যেই আকৃতিতে চেয়েছেন, তোমাকে গঠন করেছেন।' (৮২ : ৭, ৮)

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

'তিনিই তোমাদের আকৃতি দান করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন সুন্দর এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উত্তম রিযিক।' (৪০ : ৬৪)

উপরে বর্ণিত আয়াত সমূহে আল্লাহ বলেন, 'কোন ভ্রূণ মাতৃগর্ভে পূর্ণ মেয়াদকাল পর্যন্ত অবস্থান করবে তা তিনিই নির্ধারণ করেন। ভ্রূণবিদগণ ভাল করেই জানেন যে, ভ্রূণ বিকাশের প্রথম মাসেই বহু ভ্রূণপাত ঘটে থাকে। কিছু কিছু ভ্রূণপাত ঘটে জেনেটিক অপূর্ণতা জনিত কারণে এবং জাইগোট গঠিত হওয়ার পর মাত্র ৩০% ফীটাসে পরিণত হয় যা পূর্ণকালে উপনীত হতে পারে। আল্লাহ সূরা শুরার ৪৯-৫০ নং আয়াতে বলেন যে, গর্ভস্থিত শিশু ছেলে হবে না মেয়ে তা তিনিই নির্ধারণ করেন এবং তার জেনেটিক ও সোমাটিক বৈশিষ্ট্য (উচ্চতা, বর্ণ, আকৃতি, আকার, সুন্দর বা কুৎসিত ইত্যাদি) কি হবে তাও তিনিই নির্ধারণ করেন।

উপসংহার

মানব ভ্রূণের উপরে যে সকল মুসলিম লেখকগণ পাঠ্যবই রচনা করতে চান উপরের আলোচনায় তাদের জন্য একটা কর্ম পরিকল্পনা ও পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি বিজ্ঞান উপস্থাপন করা হয়েছে গাইড হিসেবে।

আল কুরআনে মানব ভ্রূণ তত্ত্ব সম্পর্কে যে সকল আয়াত রয়েছে তার বিজ্ঞানভিত্তিক সঠিক ব্যাখ্যাদান করা ১৪শ বছর আগে বাস্তব কারণেই সম্ভব ছিল না। এমনকি, পঞ্চাশ বছর আগেও নয়। মানব ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে আজকের বিজ্ঞান অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। আধুনিক ইলেকট্রনিক্স ও যন্ত্রপাতি এর জন্য সাধুবাদ প্রাপ্য। এসব বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের কারণে কুরআনের আয়াতগুলোকে ব্যাখ্যা করা ও বুঝা অনেক সহজ হয়েছে। আমাদের জ্ঞান ভবিষ্যতে যত বৃদ্ধি পাবে মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত কুরআনের বক্তব্য আমাদের কাছে তত বেশি সহজবোধ্য হবে।

টেবিল ১ : মানব ভ্রূণ তত্ত্ব বিষয়ক পাঠ্য বইয়ের সূচীপত্র।

অধ্যায় ১ : ভূমিকা।
অধ্যায় ২ : ফার্টিলাইজেশন (প্রথম সপ্তাহ)
অধ্যায় ৩ : ইমপ্লান্টেশন (দ্বিতীয় সপ্তাহ)
অধ্যায় ৪ : ট্রিলামিনার ভ্রূণ (তৃতীয় সপ্তাহ)
অধ্যায় ৫ : ভ্রূণের কাল (চতুর্থ থেকে অষ্টম সপ্তাহ)
অধ্যায় ৬ : ফীটাস কাল (নবম সপ্তাহ থেকে জন্ম পর্যন্ত)
অধ্যায় ৭ : ফীটাল মেমব্রেন ও প্লাসেন্টা
অধ্যায় ৮ : কনজেনিয়াল ম্যালফরমেশনস
অধ্যায় ৯ : কোলোমিক ক্যাভিটি এন্ড মেছেনটারিজ

অধ্যায় ১০ : শ্বসন তন্ত্র

অধ্যায় ১১ : পরিপাকতন্ত্র

অধ্যায় ১২ : ইউরোজেনিটাল তন্ত্র

অধ্যায় ১৩ : সঞ্চালন তন্ত্র

অধ্যায় ১৪ : স্কেলিটাল তন্ত্র ও ওসিফিকেশন

অধ্যায় ১৫ : পেশী তন্ত্র

অধ্যায় ১৬ : অংগ প্রত্যঙ্গ

অধ্যায় ১৭ : স্নায়ুতন্ত্র

অধ্যায় ১৮ : মাথা ও গলা

অধ্যায় ১৯ : পূর্ণ মেয়াদ।

NOTES

1-Faruqi, L.R. : Islamization of Knowledge : General Principles and World Plan. Pubihsed by International Institute of Islamic Thought, Washington, D.C., 1982.

2-Bucaille, M. : The Bible, the Qur'an and Science. Published by North American Trust Publications, Indianapolis, 1979.

3-Al-Bar, M.A. : "Alakah." Islamic World Medical Journal. 2(1): 54-56, 1986.

4-Moore, K.L. : "A Scientist's interpretation of references to Embryolgy in the Qur'an." Journal of Islamic Medical Association. 18 : 15-17, 1986.

5-Moore K.L. : "Historical Gleanings." In The Developing Human. W. B. Saunders Co. (Pub.), Philadelphia, pp. 8, 3rd edition, 1982.

6-Al-Bar, M.A. :The three veils of darkness. Islamic World Medical Journal. 2(2) : 54-56, 1986.

7-Al-Bar, M. A. : "Bone and Flesh Formation." Islamic World Medical Journal (ibid).

8-Moore, K.L.: "Historical Gleanings" in The Developing Human U.B. Saunders Co. (Pub.) Philadelphia, 1982 ■

আগামী দিনের মুসলামানদের প্রযুক্তিগত পূনর্জাগরণের ইসলামী ভিত্তি

*আলী কিরালা**

এটা বলা হয়ে থাকে যে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তাদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে মুক্ত প্রতিযোগিতা পুনরায় চালু করতে পারলে প্রযুক্তিগত পুনর্জাগরণ ঘটানো সম্ভব। পাশ্চাত্য দুনিয়া এখন একটি পতনোন্মুখ পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এর কয়েকটি কারণ আছে। লৌহ যাবনিকার পশ্চিম দিগন্তের অপ্রতিরোধ্য সুদি কারবার এবং লৌহ যবনিকার পূর্ব পাড়ের পুলিশি রাষ্ট্রের পুলিশের সীমাহীন ক্ষমতা, ডান ও বামের চরম পন্থা এবং মূল অর্থনীতির ছদ্মাবরণে প্রাইভেট কার্টেলিজম ও ডিকটেটরশীপ অব দি প্লোরেতারিয়েত কতৃক জনগণের উপর ষ্টেট কার্টেলিজমকে চাপিয়ে দেয়ায় পূর্ব ও পশ্চিমের লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ প্রচণ্ড ভীত-সন্ত্রস্ত। রাষ্ট্রযন্ত্রের অপপ্রচার বা আল্লাহর বিকল্প হিসেবে উপস্থাপিত 'সোনার হরিণ' এর প্রতি তারা আজ চরম বিতৃষ্ণ ও মোহমুক্ত। তাদের সামনে যদি মুহাম্মদ (ﷺ) কর্তৃক স্থাপিত ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও তার একনিষ্ঠ আনুগত্য ও বাস্তব রূপের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেত তাহলে তাদের জন্য ইসলামে দাখিল হবার পথ সুগম হতে পারত। কিন্তু 'মুসলিম ধর্মগুরু'গণ যান্ত্রিক উপায়ে কতিপয় অনুষ্ঠান পালনের উপর জোর দিয়ে নিজেদেরকে মধ্যস্বত্ব ভোগী হিসেবে উপস্থাপন করছে এবং রাসূল (ﷺ) প্রদর্শিত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বিপরীত শিক্ষা প্রচার করছে। বহু মুসলিম ধর্মবেত্তা (থিওলজিষ্ট) এ ধারণা পোষণ করে যে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল তথা উদ্ভাবনী চিন্তার সাথে পরকালীন মুক্তির কোন সম্পর্ক নেই। এ ধারণা পরিবর্তন করতে হবে। ইসলামে অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধারণা দিয়ে নির্যাতিত ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ মুসলিম জাতির এক বিন্দু পরিমাণ অগ্রগতিও সাধিত হয়নি। মুসলমানদের উচিত মুসলিম কৃষ্টিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সমুন্নত করার প্রচেষ্টা চালানো ও প্রতিযোগিতা করা। শুধু বসে বসে বিলাপ করে লাভ নেই। প্রতিটি মুসলিম তার রুটি রুজির জন্য যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন তার চেয়ে আরো একটু বেশি জ্ঞান চর্চার নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাস যদি গড়ে তুলতে পারত, তাহলে বিশ্বের প্রযুক্তিগত ক্ষমতাধরদের দ্বারা মুসলিম মুজাহিদগণ এভাবে নির্যাতিত ও পর্যুদস্ত হত না।

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলাম দেব-দেবীর ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং জাতিগত ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদ নীতি প্রত্যাখ্যান করায় ইসলামী আদর্শ যথেষ্ট আধুনিক বলে বিবেচিত। এ কারণে গ্যালাক্সিতে ভূ-মণ্ডলের বাইরে অন্য কোন জাতির সাথে কল্পিত (Hypothetical) যোগাযোগের ধারণা থেকেও ইসলাম সুরক্ষিত।

---

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, আরিজনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় টেম্পা, আরিজনা, ইউএসএ।

ইসলাম অধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এ কথাটি মুসলিম বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদেরকে বুঝাতে হবে যাতে তারা ইসলামী প্রযুক্তিকে মানব অগ্রগতির পুরোভাগে নিয়ে যেতে পারে।

১ম থেকে ৯ম হিজরী পর্যন্ত মুসলিম বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও স্থপতিদের চোখ ধাঁধাঁনো সাফল্য প্রতিটি মুসলমানের গৌরবের বিষয়। সে সময়ে প্রযুক্তির অগ্রগতিতে মুসলমানদের অবস্থান ছিল পয়লা কাতারে। কারিগরি জ্ঞানে প্রশিক্ষিত প্রতিটি মুসলিমের আকাঙ্ক্ষা এটাই হওয়া উচিত যে মুসলিম উম্মাহ আবার তার পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসুক। ৪০০ বছর জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের গৌরব গাঁথার কী কারণে পতন হল তা জানতে হবে।

অনেকে মনে করে, সমালোচনা করা মানে ইসলামকে আক্রমণ করা। এ কারণে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে অনেক সময় সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হয় না বা সহ্য করা হয় না। বর্তমান প্রবন্ধের ইচ্ছেও তা নয়। তাই এ ক্ষেত্রে সেই বৃটিশ কনসেপ্ট 'দি লয়াল অপজিশন' যা শুধু ভালর কথা বলবে, হেয় প্রতিপন্ন করবে না- এ নীতির আওতায় অগ্রসর হতে হবে। একজন শৈল্যবিদ ধারাল ছুরি রোগীর গায়ে চালায় রোগীর কল্যাণের লক্ষ্যেই। রোগীর শুভাকাঙ্ক্ষীগণ রোগীর গায়ে ছুরি চালানো হোক এটা মন থেকে মেনে নিতে চায় না। আলোচ্য আলোচনায় পাঠকও যদি ঐ ছুরির ব্যথা অনুভব করে তবে তাকে এতটুকু নিশ্চয়তা দেয়া যায় যে, এখানে এ আলোচনায় যা কিছু বলা হয়েছে তা ইসলামী বিশ্বের উন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থেই বলা হয়েছে।

পাঠকদেরকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করা যে, প্রযুক্তিগত পতন হল সামাজিক বৈষম্যের একটা অনিবার্য পরিণতি। প্রচলিত জনমত হল মুসলিম রাষ্ট্রগুলো উন্নয়নশীল। কিন্তু আসলে তা নয়, বরং তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো অতি উন্নত। এ আলোচনায় ব্যবহৃত পরিভাষাগুলো অর্থনৈতিক পরিভাষা কিন্তু যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক, দার্শনিক ও ধর্মীয় পরিমণ্ডল থেকে। প্রশ্ন উঠে, একটি সমাজের উদ্ভাবনী অগ্রযাত্রার পতনের কারণ কি? এর উত্তর, মুক্ত প্রতিযোগিতা দমিয়ে রাখা।

এ দমন নীতি একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলেও একটা পরিপক্ক অর্থনৈতিক সমাজে এরূপ দমন নীতির গ্রহণ যোগ্যতা নেই।

পারিবারিক ভালবাসা ও স্নেহ-মমতার ক্ষেত্রে এর একটা গভীর মনোস্তাত্বিক শিকড় বিদ্যমান। একটি পরিবারে কেউই চাইবে না যে, পরিবারের সদস্যদের সাথে পরিবারের বাইরের কারো মুক্ত প্রতিযোগিতা হোক। পরিবারের সদস্যদের পক্ষেই সবাই কাজ করবে এবং কোন বিষয়ে অগ্রাধিকারের প্রশ্নেও বাইরের লোকদের তুলনায় পরিবারের সদস্যরাই অগ্রাধিকার পাবে। পরিবারের প্রতি এ ধরনের দায়বদ্ধতা খুবই

স্বাভাবিক। পরিবারের প্রতি এ আনুগত্যের প্রতিচ্ছবি দেখা যায় সমাজের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে, সম্প্রদায়, জাতিগত গ্রুপ, ধর্মীয় সম্প্রদায়, কোম্পানি, দল, নগর, রাষ্ট্র বা দেশ সবখানে। যখনই এ ধরনের কোন গ্রুপ গঠিত হয় তখন এর অনুসারিদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার নীতি প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর পক্ষে দাঁড় করাতে হয় নানান যুক্তি। যখন বিশেষ গ্রুপের সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা বনাম আম জনতার সুযোগ-সুবিধার প্রশ্ন ওঠে, তখন দেখা দেয় প্রতিযোগিতা দমন নীতি। আর এ দমন নীতি পরিচালিত হয় ঐ বিশেষ দলের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে। এসব দলের ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা যত বৃদ্ধি পায়, প্রতিযোগিতাও তত বেশি দমিত হয়।

একটা নবগঠিত সমাজে প্রায় সবকিছুই থাকে অগোছালো এবং মুক্ত প্রতিযোগিতা থাকে উন্মুক্ত। দ্রুত বিকাশমান বাজারের চাহিদা মিটানোর জন্য তখন নিত্য-নতুন জিনিস তৈরি ও উদ্ভাবনের মাতামাতি চলতে থাকে। এ ধরনের মুক্ত প্রতিযোগিতার দলগুলো দক্ষতার সাথে সংগঠিত হয়ে ক্রেতা চাহিদা পূরণে সক্ষম হয় এবং কম দক্ষ গ্রুপগুলো যারা ক্রেতা চাহিদা পূরণে অক্ষম, স্থানচ্যুত হয়। পূর্বের অদক্ষ দলের হাত থেকে বাজার মুক্ত হয়ে দ্রুত ও সফলতার সাথে তার সম্প্রসারণ ঘটে থাকে। এভাবে আস্তে আস্তে এ গ্রুপ বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে শেষে একটা কারটেল সিন্ডিকেট গড়ে তোলে ও বাজারকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে যেখানে আর প্রতিযোগিতার প্রয়োজন হয় না।

এ অবস্থায় সংগবদ্ধ চক্র (সিন্ডিকেট) চেষ্টা করে ব্যয় কমাতে এবং যখন আর কোন প্রতিযোগিতা থাকে না এবং ক্রেতার অন্য কোন দিকে যাওয়ার সুযোগ থাকে না তখন তারা নিজেদের খুশীমত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়। ক্রেতাদেরকে হয় ঐ দামেই পণ্য কিনতে হয় না হয় না কিনেই ফিরে যেতে হয়।

এরূপ অবস্থায় আসলে পণ্যের গুণগত মান ও ক্রেতা সেবা কমতে থাকে। প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার প্রয়োজনে নিত্য নতুন উদ্ভাবন ব্যবসার একটা প্রধান বিষয়। কিন্তু সিন্ডিকেট তৈরি হয়ে গেলে এ উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না এবং এর জন্য অর্থ ব্যয়কে অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। নতুন নতুন ডিজাইন বের না করে প্রচলিত আইটেম দিয়েই বাজার চালু রাখা বেশি লাভজনক। এতে কোন 'ঝুকি মূলধনের' প্রয়োজন হয় না। পূর্বে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার যে পর্যাপ্ততা ছিল, সেগুলো আর পাওয়া যায় না। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ দেখা যায় অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী গ্রুপগুলো সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে যাতে দ্রব্য মূল্য না কমে। অথচ ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা কিন্তু উঠা নামা করে। এটাকে কোন অবস্থাতেই মুক্ত অর্থনীতি বলা যাবে না, পুঁজিবাদও নয়। কারণ পুঁজিবাদ ব্যবস্থায়ও মুক্ত প্রতিযোগিতার একটা সুযোগ থাকে। বরং অর্থনীতির এ ব্যবস্থা

সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে অপরিবর্তনশীলতার দিকে নিয়ে যায় যেখানে সমাজের উদ্ভাবনীর অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্থ হয় এবং জন্ম হয় শ্রেণীভিত্তিক সমাজ কাঠামো। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো মুক্ত অর্থনীতি অপেক্ষা সংঘবদ্ধ চক্রের অর্থনীতির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় সুবিধাভোগী সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা যারা সাধারণত নাগরিকদের প্রতি খুবই সমালোচনামুখর ও বিদ্বেষী। অবশ্য দু-চার জন কল্যাণকামী সরকারি কর্মচারী যে নেই তা নয়। তবে সীমিত সংখ্যক এ মহৎ প্রাণ মানুষগুলো অসৎ সর্বগ্রাসীদের পরিবেশে কতক্ষণ টিকে থাকবে? কার্টেল শব্দটি দ্বারা আধুনিক যুগে বহুজাতিক কর্পোরেশনের একটা চিত্র ফুটে উঠে। কিন্তু এখানে এ শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে এমন একটি সংঘবদ্ধ গ্রুপকে যারা মূল প্রতিযোগিতা দমন করতে সক্ষম। এর পূর্ব পুরুষ ধনতন্ত্র এবং ফিউডাল কার্টেলিজমের প্রভাব এখনও আমাদের মাঝে প্রবল। সমাজে প্রতিযোগিতা যখন নিঃশেষ হয়ে যায় তখন সমাজ শ্রেণী স্বার্থের শিকলে বাঁধা পড়ে এবং উদ্ভাবনী অগ্রযাত্রাকে প্রতিবন্ধক ভেবে তাকে অপসারণ করা প্রয়োজন মনে করে ঐ স্বার্থান্বেষী মহল।

আমাদের মধ্যে এ ধরনের সংঘবদ্ধ চক্রের জ্বলন্ত উদাহরণ রয়েছে যারা যুগ যুগ ধরে টিকে আছে এবং এখনও তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এরা সমাজের পিপড়া, মৌমাছি ও টারমাইটস।

এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ব্যক্তি মানুষের মধ্যে রয়েছে বিশাল এক শক্তি। কিন্তু আমাদের সমাজ খুব বেশি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত বিধায় এ সমাজের মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে যান্ত্রিক সমাজের গুণ বৈশিষ্ট্য, যেখানে পূর্ব নির্ধারিত চাপিয়ে দেয়া কোন আচার-আচরণের ব্যত্যয় শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। এরূপ আড়ষ্ট সমাজে ব্যক্তির কোন মর্যাদা ও প্রাইভেসি থাকে না। রাষ্ট্রীয় নীতিমালার বাইরে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা উদ্ভাবনী শক্তি ও চিন্তা-চেতনার কোন মূল্য নেই এবং রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা যায় না। এ ধরনের রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককেই একে অন্যের উপর গুপ্তচর বৃত্তি করতে হয় যাতে সকলেই রাষ্ট্রের আনুগত্য করতে বাধ্য থাকে।

রাসূল (ﷺ) এ ধরনের গুপ্তচর বৃত্তি নিষেধ করেছেন এবং অযৌক্তিকভাবে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের নীতিকে তিনি সমর্থন করেননি। রাষ্ট্র তার শক্তির যোগান পায় জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন থেকে এবং তাদের প্রতি যে ন্যায় বিচার করা হয় তা থেকেও রাষ্ট্রের প্রতি তাদের সমর্থন প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহানবী (ﷺ) সুদের কারবারকেও নিষিদ্ধ করেছেন। এ সুদই পাশ্চাত্য দুনিয়ার অর্থনীতিকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। পাশ্চাত্য নীতিতে সুদকে যুক্তিযুক্ত তথা জায়েজ

করে নেয়া হয়েছে এ যুক্তিতে যে, এতে মূলধন বৃদ্ধি পায় যার ফলে উৎপাদনশীলতারও বৃদ্ধি ঘটে। অর্থনীতির এ অবস্থায় উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধিকে দারুণভাবে সংকুচিত করা হয় যেখানে বাস্তবে কোন প্রবৃদ্ধি ঘটে না এবং সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার বিস্তার দ্রুত গতিতে ছড়াতে থাকে যার ফলশ্রুতিতে ঘটে মুদ্রাস্ফীতি। এতে সমাজের সুসংহতি ভেঙ্গে পড়ে এবং শ্রমিক শ্রেণী ও মালিক পক্ষের জীবন ধারণ মানের বিশাল তারতম্য সৃষ্টি হয়, আর মালিক পক্ষ মুদ্রাস্ফীতির ভারসাম্য বজায় রাখতে দ্রব্য মূল্য বাড়িয়ে দেয়। পাশ্চাত্যে মুদ্রাস্ফীতির জন্য কাউকে দায়ী করা হয় না কিন্তু এটা শ্রমজীবীদেরকে আরো দারিদ্রের দিকে ঠেলে দেয়ার একটা দক্ষ কৌশল, যা ইচ্ছাকৃতও বটে।

লৌহ যবনিকার পশ্চিম প্রান্তের মানুষদের আজ সুদী কারবার, মুদ্রাস্ফীতি, বস্তুবাদ থেকে মোহমুক্তি ঘটেছে। একইভাবে রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, কথা বলা ও চলাফেলার স্বাধীনতার উপর নিষেধাজ্ঞা, শাসকদের অর্থনৈতিক সুবিধাবাদ, গোয়েন্দা পুলিশের সীমাহীন নজরদারী এবং বিচার ব্যবস্থায় পূর্বনির্ধারিত রায় এ সকল বিষয়ে লৌহ যবনিকার পূর্ব পাড়ের লোকদের সম্বিত ফিরে এসেছে।

ইসলাম বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথা বলে যেখানে গুপ্তচর বৃত্তি ও সুদের কারবার নিষিদ্ধ, নারীর মর্যাদা সংরক্ষিত এবং রয়েছে সম্পদশালী ও ক্ষমতাশালীদের রাষ্ট্রের প্রতি বাধ্যবাধকতা এবং সম্পদহীনদের সহায়তা করার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার। পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনীতি আজ সুদের মহাসমূদ্রে নিমজ্জিত হওয়ায় ব্যর্থ এবং পূর্ব ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহ অতিরিক্ত খবরদারীর কারণে ব্যর্থ। এ অবস্থায় মুসলিম বিশ্ব যদি তাদের সমাজে মুক্ত প্রতিযোগিতার উপাদান পুনরায় চালু করতে পারে তাহলে পূর্বের সেই গৌরবময় অবস্থায় আবার ফিরে যেতে সক্ষম হবে। জনসাধারণের মধ্যে যোগ্যতার ভিত্তিতে পর্যাপ্ত কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ পারিবারিক সুযোগ-সুবিধার নীতি থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামী ঐক্য ও সাধারণের প্রতি দৃষ্টি প্রদানের ভিত্তিতে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহলের বলপ্রয়োগের নীতি পরিত্যাগ করে মুক্ত প্রতিযোগিতার চেতনাকে পূনরুজ্জীবিত করতে হবে। মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন মতের শিক্ষকদের কর্মের ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। এর অর্থ শিক্ষকগণ জোর করে ছাত্রদের উপর নিজেদের মত ও পথ চাপিয়ে দিতে পারবে না, ছাত্রদেরকে এ থেকে মুক্ত করতে হবে। বিদেশে মুসলিম বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষ চমৎকার কৃতিত্ব দেখালেও মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা কর্ম দেখা যায় না। বেশি বেশি মুক্ত প্রতিযোগিতা ও উদ্ভাবনী কর্মের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখতে পারলে এ অবস্থার পরিবর্তন আনা সম্ভব। শিক্ষকতা করতে হলে আরো বেশি জানতে হবে- এ ধরনের ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আগ্রহ কমিয়ে ও উদ্যম দমিয়ে ফেললে চলবে

না। আমাদেরকে অবশ্যই মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষা দানের নতুন নতুন পন্থা বের করতে হবে। পাশ্চাত্যের হুবহু অনুকরণ দিয়ে সৃজনশীল কিছু করা সম্ভব নয়।

গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গি আঁকড়ে ধরে থাকা এবং আত্মার মুক্তির জন্য কিছু আনুষ্ঠানিক এবাদত বন্দেগীর উপর সবিশেষ জোর দেয়ার ন্যায় কতিপয় যান্ত্রিক ফর্মুলাই মূলতঃ মুসলমানদের জীবনে বিজ্ঞান চর্চার অভাবের জন্য দায়ী। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হতে এসব ধ্যান-ধারণা বাদ দিতে হবে। এর অর্থ এ নয় যে, ইসলামী দর্শনশাস্ত্রও পড়ানো যাবে না। ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তির ব্যাপারে যাদের বিশ্বাস খুব দুর্বল তাদের মনে এ ভীতি কাজ করতে পারে যে, উন্মুক্ত আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হলে হয়ত ইসলামের আদর্শ ও বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বাধা-বিপত্তিহীন জ্ঞান অর্জনের পক্ষে কথা বলেছেন এবং যন্ত্রের ন্যায় শুধু পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালনের অকার্যকারিতা সম্পর্কে সাবধান করেছেন। পারস্পরিক সমঝোতা ও নিষ্ঠাপূর্ণ বিশ্বাসের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং মুসলমানদের মধ্যে মোল্লাতন্ত্র যাতে সৃষ্টি হতে না পারে সে বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করেছেন। দ্বীনের মধ্যে কোন জবরদস্তি নেই- সূরা বাকারায় এ কথাটি স্পষ্ট বলা হয়েছে। এমনকি জোর করে কাউকে নামাজ পড়তে বাধ্য করাও একটি শিশুসুলভ আচরণ। আল্লাহ্ নিষ্ঠাবান ও মুনাফিকের পার্থক্য বুঝেন। যদিও ইসলামী ফান্ডামেন্টালিস্টদের ইসলামী আইনের দিকে ফিরে আসার যে আহ্বান তা মূলতঃ কতিপয় মধ্য প্রাচ্য সরকারের দুর্নীতি ও অপচয়ের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কোন বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ংগম না করে শুধু কতিপয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করলেই আত্মার মুক্তি লাভ ঘটবে জনসাধারণের মধ্যে এরূপ ধারণা প্রদান করা হলে তা ইসলামের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ইসলামের চিন্তা-ভাবনার বিষয়গুলো শুধু মৌলভী সাহেবদের ওপর ছেড়ে দিয়ে সাধারণ জনতার জন্য যান্ত্রিকভাবে শুধু অনুষ্ঠানাদি পালনের ইসলাম চালু করলে তা হবে রাসূল (ﷺ)-এর মহান শিক্ষার পরিপন্থী।

এখন দেখা যাক ইসলামী বিশ্বাসগুলো কিভাবে বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মহানবী (ﷺ) জোর তাকিদ দিয়েছেন জ্ঞান অর্জনের জন্য। ইসলামী বিশ্বাসে আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা হচ্ছে তিনি নিরাকার এবং মানুষ বা অন্য কোন সৃষ্টির আকার-আকৃতির ধারণা থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র।

তাই ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা বিশ্বলোকের যেকোন ধরনের পরিবর্তন ও নতুনত্বের সাথে মৌল চিন্তা ও স্বকীয়তা বজায় রেখে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম। ইসলাম নৈতিক আচরণে সকল বুদ্ধি বৃত্তিক সৃষ্টির জন্য একটা সার্বজনীন যুক্তির পথ নির্দেশ করে থাকে। ইসলামে কোন ভণ্ডামী ও জাতিগত বিদ্বেষের স্থান নেই।

নাস্তিকরা মনে করে খোদা বলে কেউ নেই এবং বিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রেও কোন সার্বজনীন নিয়ম-নীতি বা নিয়ন্ত্রক নেই। তাদের এ বিশ্বাসের কোন প্রমাণ নেই। তারপর যুক্তির খাতিরে যদি এটাকে সত্য বলে ধরে নেয়াও হয় তাহলেও তা হবে বিজ্ঞানের সাথে বড় ধরনের সংঘাত। কারণ সৃষ্টি জগৎ যেভাবে বৈজ্ঞানিক নিয়ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে অনেক বিষয়ে কিছু কিছু আগাম ঘটনার আভাস দেয়া সম্ভব।

কোন ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করাতে (পরিসংখ্যানগত বা নির্ধারিত) বিশ্বাস রাখা বিজ্ঞানের (প্রাচীন ও আধুনিক) মৌল বিষয়। যুক্তি মানব মনের একটা শক্তিশালী উপকরণ। তা পারিপার্শ্বিকতা থেকে কিছু ধারণা লাভ করতে পারে মাত্র। মানুষের বিশ্বাসে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অকাট্য যুক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারে না। নিরাপত্তা বোধ নিয়ে এ জগতে চলতে হলে মানুষের মধ্যে ধর্ম বিশ্বাস থাকতেই হবে। এমনকি জীবনের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়ার পক্ষে যেসব যুক্তি রয়েছে সেগুলোরও ভিত্তি বিশ্বাস।

ইসলামের মূলমন্ত্র যে তাওহীদ তা গোটা বিশ্বজগতের সকল প্রাকৃতিক আইনকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে এবং যাকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত প্রাচীন মিশরীয়রা 'নেটার' (ল্যাটিন ভাষায় ন্যাটুরা) বলে আখ্যায়িত করেছে, সেই তাওহীদের ধারণা মানুষকে একদিকে মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতা দিয়েছে অপরদিকে, প্রদত্ত জ্ঞান সীমার মধ্যেই প্রাকৃতিক ঘটনাবলী নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে বলেছে। বহু ঈশ্বরবাদে একক ক্ষমতার ধারণা অনুপস্থিত। ফলে সেখানে বহু দেবতার বহু পথের যাত্রায় গভীর অনুসন্ধানমূলক কোন গন্তব্যে পৌছা সম্ভব হয় না। সেই বিবেচনায় তাওহীদের আকিদা আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্য এক শক্তিশালী চালিকা শক্তি।

ইসলামের যাকাত বিধান মতে একজন মুসলমানের সম্পদের ৪০ ভাগের এক ভাগ অভাবী অন্য ভাইয়ের মধ্যে বিতরণ করার কথা। কিন্তু শুধু সম্পদ বিতরণই এর মূল লক্ষ্য নয়, এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আরো অনেক ব্যাপক। মুসলিম বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীর নিকট এর অর্থ এ যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের যে চেষ্টা সাধনা তারা করছেন তার গতি কখনও থামানো যাবে না, এ প্রচেষ্টাকে নিরবচ্ছিন্ন ও অব্যাহত রাখতে হবে। যখন দেখা যাবে বিশ্বের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের তুলনায় এককভাবে এক একজন মুসলমানের অবস্থা উজ্জ্বল তারার মত জ্বলজ্বল করছে, তখন বুঝতে হবে ইসলাম স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। একটি মুসলিম পরিবার অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ, সামাজিকভাবে অধঃপতিত বা রাজনৈতিকভাবে নির্যাতিত থাকার অর্থ গোটা মুসলমান উম্মাহরই অপমান। যাকাতের এ ব্যাখ্যাই ইসলামকে আবার বিশ্ব অগ্রগতির সম্মুখ দুয়ারে পৌছে দিবে। ইসলামে সিয়ামের যে

বিধান তার অর্থ শুধু এ নয় যে, রমযান মাসে স্বাস্থ্য ভাল থাকলে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকা। এর অর্থ আরো ব্যাপক, আরো তাৎপর্যবাহী। অভাবী ও ভাগ্যাহতদের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি ও সামাজিক সচেতনতার বিষয়টি সিয়ামের আসল স্পিরিট। যতক্ষণ একজন মুসলমানও অনাহারে থাকবে ততক্ষণ কোন মুসলিম বিজ্ঞানী বা প্রকৌশলী এর মূল সমস্যার সন্ধান ও সমাধান না করা পর্যন্ত বিশ্রাম নিতে পারে না। পাশ্চাত্যের পরিবেশগত অব্যবস্থাপনার কারণে সংঘটিত সাহেল খরা সমস্যা এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

মুসলিম কনসোর্টিয়াম ব্যাংকসমূহ 'ফাট্টারা ইনল্যান্ড ফ্রেশওয়াটার লেক প্রজেক্ট' এর ন্যায় একটি প্রজেক্টের কৃষি, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিপুল কল্যাণের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাতে অর্থ যোগান দেয়নি। কেন দেয়নি তার পক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। পরমাণু বিস্ফোরণ দ্বারা ভূমধ্যসাগর হতে একটি খাল নির্মাণ করা যেতে পারে এবং এলিভেশন ডিফারেন্স দিয়ে জলবিদ্যুতের সাহায্যে একটি লবণমুক্তকরণ প্লান্ট চালানো যেতে পারে। একজন দানশীল ব্যক্তি কর্তৃক দরিদ্রজনের মুখে এক মুঠো অন্ন তুলে দেয়া অপেক্ষা অনেক ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী চিন্তা নিয়ে মুসলিম প্রযুক্তিবিদদের আগাতে হবে।

হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় যেতে হয় এবং প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হয়। এটা হচ্ছে বাধ্যবাধকতা। কিন্তু শুধু এ আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই হজ্জের প্রকৃত তাৎপর্য সীমিত নয়। হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আরো ব্যাপক, আরো বিশাল। হজ্জের সময় একটি কেন্দ্রীয় ইসলামী তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে যার সাথে থাকবে একটি পূর্ণাঙ্গ যাদুঘর, গ্রন্থাগার এবং টেপভিত্তিক টিউটোরিয়াল কোর্সের ব্যবস্থা যাতে প্রত্যেক হাজী তার পেশা ও দক্ষতার মান সম্পর্কে অবহিত হয়ে পেশাগত কাজে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পায় এবং নিজ দেশে ফিরে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকে আরো গতিময় করতে পারে। এভাবে ইসলামী প্রযুক্তি আবার মানব কল্যাণের কাজে লাগতে পারে।

নামাজের বিধানে আল্লাহর গুণগান গাওয়া হয়েছে, সঠিক পথের সন্ধান চাওয়া হয়েছে, ভ্রান্ত পথ থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাওয়া হয়েছে এবং পানা চাওয়া হয়েছে ঔদ্ধত্যতা থেকে যা মানুষকে সৃষ্টিশীল চিন্তা থেকে গাফেল করে দেয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে সালাত এ কয়টি কাজের বাইরেও অনেক বিশাল দর্শনের কথা বলে, সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের উন্নতির কথা বলে। মানুষ তার সর্বোচ্চ বুদ্ধি ও মেধা কাজে লাগিয়েও যদি কোন কাজ করে এবং চলার পথে এগোতে থাকে তাহলে সাময়িক কিছু ফল লাভে সক্ষম হলেও চলার জন্য আল্লাহ যে পথ নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে না চললে চরম সাফল্য অর্জন কখনই সম্ভব নয়, পথিমধ্যে তাকে হোঁচট খেতেই হবে, ভ্রান্ত মঞ্জিলে

পৌঁছতে হবে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে বিশ্ব প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের সমৃদ্ধির জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং আল্লাহর মর্জির কাছে সমর্পণ করা। ব্যক্তি জীবন আলস্যে কাটায়ে বা গোটা উম্মাহর ঘুমিয়ে শত বছর পার করে দেয়া আল্লাহর প্রতি সমর্পণ নয়। আল্লাহ যার যতটুকু সামর্থ দান করেছেন কোন মানুষ যদি নিজের মন ও মননের উন্নয়নের কাজে তা যথাসাধ্য ব্যয় না করে তাহলে সে নিজেকে বরং পিছন দিকে টানতে টানতে পশুর স্তরে নিয়ে ছাড়ে। একথা মনে রাখা দরকার যে, আদালতে আখেরাতে মানুষ কি কাজ করতে পারত সে প্রশ্নের চাইতে কি কাজ করতে চেয়েছে সে তার উপরই তার বিচার কার্য পরিচালিত হবে (ব্যতিক্রম ছাড়া)।

এ হল ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ। প্রত্যেক মুসলিম বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীকে এগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। আনুষ্ঠানিক ইবাদতই সবকিছু এটা ভাবলে চলবে না, বরং এগুলোকে ন্যূনতম ফরজ মনে করে এর বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি ঘটাতে হবে ইসলামী প্রযুক্তির পূর্ণাঙ্গ দর্শনকে সামনে রেখে এবং মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে চালনার নিরিখে। ইসলামের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান ধর্মীয় বিশ্বাসের বাইরের কোন বিষয় নয়, বরং বিজ্ঞান মুসলিম উম্মাহর জীবনবোধের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ■

বিজ্ঞানী তৈরিকরণ : একজন মুসলিম বিজ্ঞানীর ইসলামায়ন

*এম এ কে লোদী**

সারসংক্ষেপ

আলোচ্য প্রবন্ধে একজন বিদগ্ধ বিজ্ঞানী বা গবেষণা কর্মী তৈরির বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সমকালীন গবেষণা সম্বন্ধে এখানে আলোচনা হয়েছে যেভাবে আধুনিক সমাজে হয়ে থাকে। মুসলিম বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনের ইসলামায়ন সম্পর্কে কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। ব্যক্তিগত যোগাযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। উত্তম কর্মের একটি কেন্দ্র গড়ে তোলার মাধ্যমে ব্যক্তিগত যোগাযোগের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে।

১. ভূমিকা

বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসমষ্টির শতকরা ২৫ ভাগ মুসলমান। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান তাদের সংখ্যার অনুপাতের তুলনায় অনেক কম। এ মুহূর্তে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে মুসলমানদের ভূমিকা বৃদ্ধির কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তাকে অবশ্যই সর্বমহল থেকে আন্তরিকভাবে স্বাগতম জানানো হবে। এর জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করা হবে বা এর পেছনে কত অর্থ ব্যয় হবে সে প্রশ্ন পরে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার জন্য কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে সেটাই বড় কথা।

সম্প্রতিকালে সমগ্র মুসলিম জাহানব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রসর, গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষে বহু মুসলিম দেশে নতুন মন্ত্রণালয়, সেন্টার, ফাউন্ডেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক এবং অনেকক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রদের ন্যায় উন্নত দেশের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ পরিচালিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক। শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নয়, যে কোন বিষয়েই গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক উন্নয়নমূলক কাজের গুরুত্ব সব সময় বেশি। জ্ঞান অন্বেষণ, নতুন জ্ঞানের উন্মেষ, অন্যের সাথে শেয়ার করা, মানব কল্যাণে জ্ঞানকে কাজে লাগানো ইত্যাদি কাজ ইসলামী দর্শনের চেতনার সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইসলামী চেতনাটা কী এবং জ্ঞান

---

* পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, টেক্সাস টেকনিক্যাল ইউনির্ভাসিটি, লুবক, টেক্সাস, ইউএসএ।

ও গবেষণা কর্মের পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে এটাকে কীভাবে ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে? আমরা এ প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং মুসলিম বিশ্বের গবেষণা কর্মের জন্য একটা মডেল উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

২. নতুন জ্ঞানের মডেল

অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে যে সকল গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হয়েছে তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য গবেষণা কর্মে অনুসৃত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এগুলোর দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সবই সেকুলার জীবন বোধ নির্ভর। এক্ষেত্রে যে দেশের মডেল অনুসরণ করা হয়েছে সেটা সে দেশের জন্য উপযুক্ত হতে পারে, কিন্তু যারা অনুসরণ করেছে তাদের দেশ-কাল-পাত্র, আদর্শ, সরকারী নীতি, সমাজের চাহিদা ইত্যাদি বাদ বিচার না করে হুবহু অনুসরণ বা অনুকরণ করা হলে তা কাঙ্ক্ষিত মানে কার্যকর হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে গবেষণা কী, উন্নত দেশসমূহে এটা কীভাবে করা হয়েছে, এর মধ্যে কতটুকু এবং কোন পর্যায়ে ইসলামায়নের সুযোগ আছে ইত্যাদি বিষয় আমাদেরকে দেখতে হবে।

আলবার্ট জেন্ট গিওরগি (Albert Szent Gyorgyi) এর ভাষায়, *'গবেষণা হল সেই জিনিস দেখা যা অন্যরা দেখেছে, সেই জিনিস সম্পর্কে চিন্তা করা যে বিষয়ে অন্যরা চিন্তা করেছে।'*

গবেষণায় মূল লক্ষ্য শুধু ঘটনার বাহুল্য নয়, বরং প্রয়োজন তথ্যের কৌশলগত মূল্য নিরূপণে যা নিম্নরূপ :

১. কোন সমস্যা স্পষ্টিকরণের দিকে নির্দেশনা দান;
২. কোন ঘটনার গভীরে অনুপ্রবেশ করার অন্তর্দৃষ্টি;
৩. পূর্বে যে সকল তথ্য ও ধারণার প্রসঙ্গ আনা হয়নি সেগুলো সংযোজিত করা এবং
৪. মানবজাতির উপর প্রভাব ফেলে এরূপ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা উপস্থাপন করা।

অনেক মানসম্মত কাজ আছে সেগুলোকে গবেষণা বলে বিবেচনা করা হয় না। যেমন বলা হয়, গবেষণা কোন পাঠ বা শিক্ষা নয়, গবেষণা কোন অনুশীলন নয়, নয় কোন পরামর্শ বা ব্যবস্থাপত্র। গবেষণা হল কোন সমস্যার নতুন সমাধান তালাস করা বা সমস্যা চিহ্নিত করার নতুন পথ বের করা। কোন কাজকে তখনই গবেষণা কর্ম হিসেবে গণ্য করা যায় যদি তার মধ্যে মৌলিকত্ব বা নতুনত্ব থাকে। অথবা পূর্বের কোন গবেষণা কর্মকে ভিন্ন অবস্থা বা আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়। গবেষকের গবেষণা কর্ম দিয়ে সৃষ্টি হয় নতুন জ্ঞান বা চিন্তা। গবেষণা লব্ধ ফলাফল বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদে পরিণত হতে পারে এবং সমস্যা সমাধানে নতুন দিক নির্দেশনা দিতে পারে।

বিশ্বদ্যািলয়ের গবেষণা বলতে বুঝতে হবে মূল সমস্যা সমাধানের এক ব্যাপক ভিত্তিক কর্মকাণ্ড যার লক্ষ্য হবে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, মূল নমুনা, পেটেন্টস, উৎপাদন উপস্থাপন, উদ্ভাবন হস্তান্তর ইত্যাদি এবং যারা এগুলো গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের মধ্যে এটা ছড়িয়ে দিতে হবে। সমকালীন গবেষণা কর্মকাণ্ডকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে :

১. মৌলিক গবেষণা : এতে আমরা যা ঘটতে দেখি তা কেন ঘটে এ প্রশ্নের জবাব থাকবে। এখানে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হবে।

২. ফলিত গবেষণা : একটা ধারণাকে বাস্তবে রূপদান করা এ ধরনের গবেষণার লক্ষ্য।

৩. উন্নয়ন : একটা মডেলকে পরিবর্তন/পরিমার্জনের মাধ্যমে আরো উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।

৪. উৎপাদনমুখী গবেষণা : একটা নতুন উৎপাদন স্পন্সরের জন্য ডিজাইনের প্রস্তাবনা বা উৎপাদন প্রক্রিয়া আরো উন্নত করা।

৫. প্রযুক্তি হস্তান্তর : উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে মানুষের কর্মশক্তির সম্প্রসারণ ঘটানো।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ সকল কর্মের আনুপাতিক হার যথাক্রমে ৬৪%, ২৩%, ৮%, ২% এবং ৩% যা প্রতি শ্রেণীর জন্য প্রদত্ত গবেষণা তহবিল থেকে পরিচালনা করা হয়। গবেষণা তহবিলের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ হচ্ছে ৯×১০^{৯} ডলার এবং মোট গবেষণা বরাদ্দ ৬৩×১০^{৯}৯ ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের ২৩০০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট গবেষণা কর্মের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ২০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০% এবং ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৯% গবেষণা পরিচালনা করে। ৬৩×১০^{৯} ডলারের মধ্যে আনমানিক ৪০×১০^{৯} ডলার ব্যয় হয় ফলিত ও উন্নয়নমূলক গবেষণার জন্য। এ বিভাজন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আদর্শ হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে, তবে মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যায়লগুলোর জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। ইসলামায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন গবেষণা মডেলকে অনুসরণ করার পূর্বে প্রথমে প্রয়োজন মুসলমানদের নিজেদের সম্পদের একটা তালিকা প্রস্তুত করা। এতে কোন কোন ক্যাটাগরী ও বিষয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। সেক্ষেত্রে স্থান কাল ভেদে পার্থক্য থাকতে পারে। একটা মুসলিম রাষ্ট্রে কোন এক সময় গবেষণা ক্যাটাগরী অনুপাতে (উপরে বর্ণিত বিন্যাস অনুযায়ী) হয়ত হবে ১০%, ২০%, ৬%, ৫% ও ৫%। একই রাষ্ট্রে অন্য কোন সময় এ অনুপাত অন্য রকম হতে পারে বা একই সময়ে অন্য কোন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে হয়ত ভিন্ন চিত্র পাওয়া যাবে। ইসলামায়নের গুরুত্বের উপর জোর দেয়া হয়েছে যেখানে ইনফিউশন খুব জরুরী মনে হয়েছে। ইসলামায়নের ক্ষেত্রে গবেষণা

শ্রেণীর আরেক প্রকার বিভাজন করা যায়। ১. ইনপুট ২. প্রসেস এবং ৩. আউটপুট। গবেষণা পদ্ধতি বিজ্ঞান রিভিউ করা এবং ইসলামী চিন্তার সাথে একে ইনডক্ট্রিনেট করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে গবেষণার কাজ করার জন্য এটাকে একটা মিশন হিসেবে গ্রহণ করে মুসলিম বিশ্বে সম্পদের উপর একটা ব্যাপক অধ্যয়ন কর্ম পরিচালনা করতে হবে। স্ব স্ব বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে প্রস্তাবনা আনতে হবে এবং আই আই আই টি এর ন্যায় একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের মাধ্যমে এগুলো যথাযথভাবে অনুকরণ ও হালনাগাদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এসব তালিকা পরবর্তী উন্নয়নমূলক কাজে অন্যদের সাথে যৌথভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে কর্মরত পদার্থবিদ ও গত ১৫ থেকে ২০ বছরে তাদের আউটপুট যোগাড় করা গেলে তা থেকে যে কোন গবেষণা মডেলের জন্য একটি বাস্তব চিত্র পাওয়া যাবে। অথবা মুসলিম বিশ্বের পদার্থবিদ্যা এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিজ্ঞানের জন্য একটি পদ্ধতি বিজ্ঞান (Methodology) দাঁড় করানো সম্ভব হবে।

৩। সমকালীন বিজ্ঞান জরিপ

গত ১৫ থেকে ২০ বছরে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানের উপর যে গবেষণা ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রকাশনা কাজ সম্পাদিত হয়েছে সে সম্পর্কে জাতি ও বিষয়ভিত্তিক একটি সুবিন্যস্ত ও ধারাবাহিক জরীপ হওয়া দরকার। বিজ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্র ও বিশেষ ভৌগলিক অঞ্চল ভিত্তিক ডাটা বিশ্লেষণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তানে পদার্থ বিজ্ঞানের কথা বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে এবং সাধারণভাবে সারা বিশ্বে বলা যেতে পারে। গত ১০ বছরে এ ক্ষেত্রে কি অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার একটা সূচক নির্ণয়ের মাধ্যমে কেইস স্টাডি করা যেতে পারে।

নিচের চিত্র ১ এ পদার্থ বিজ্ঞানে গবেষণা প্রকাশনার একটা সার্বিক প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। লক্ষণীয় যে, মুসলিম বিশ্বের পদার্থবিদদের গবেষণা প্রকাশনার হার পদার্থ বিদ্যা গবেষণার সার্বিক প্রবৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশী। এতদসত্ত্বেও পদার্থবিদ্যা গবেষণার এতবড় সাফল্য ম্লান হয়ে যায় যখন জনসংখ্যার বিবেচনায় মুসলিম বিশ্ব ও অন্যান্য দেশের পদার্থ বিজ্ঞানের সার্বিক গবেষণা তুলনা করা হয়। ভাগ্যের পরিহাস, এ পর্যায়ের প্রায় সকল মুসলিম বিজ্ঞানীই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও এরূপ দু' একটা ব্যতিক্রম ছাড়া নিজেদের দেশ ছেড়ে হয় অন্য দেশে বসবাস করছে, না হয় সেখানে গবেষণা কর্মে নিয়োজিত আছে। মুসলিম বিজ্ঞানীদের অভিবাসনের ধারাবাহিকতা অব্যহত রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা পাকিস্তানে পদার্থ বিজ্ঞানের একটা বাস্তব অবস্থা।
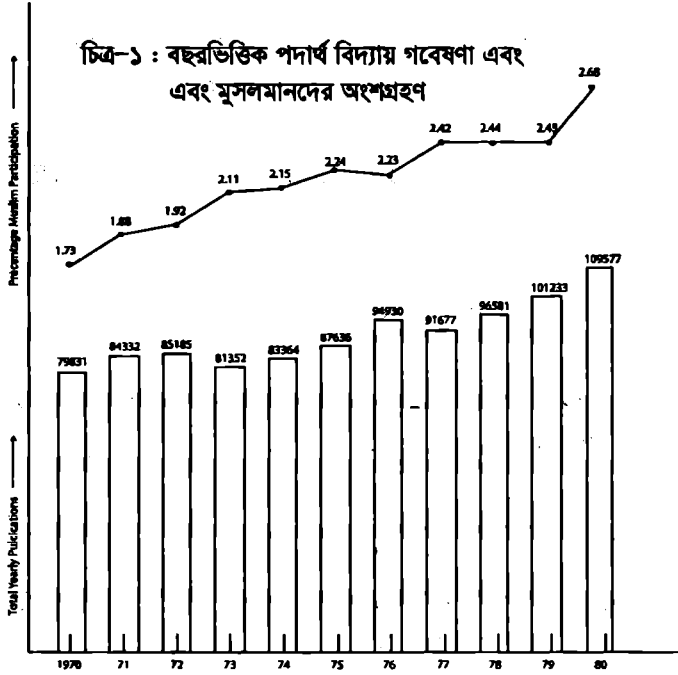
এ অবস্থা চলতে থাকলে পরিস্থিতি সংকটাপন্ন হতে বাধ্য। এ দেশে এবং বিজ্ঞানের এ ক্ষেত্রে যা অবস্থা অনুরূপ অবস্থা ও চিত্র অন্যান্য অঞ্চল ও ডিসিপ্লিনের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হতে পারে। তাই এ বিষয়ে বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে একটা পূর্ণাঙ্গ জরীপ পরিচালনা ও সুপারিশ গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

মুসলিম দেশসমূহে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যদি কিছু থেকে থাকে, বিজ্ঞানের মূল ধারায় প্রবেশ করার ইচ্ছে থাকলে নিজেদের ধন-সম্পদ দিয়েই সে ইচ্ছে পূরণ করা সম্ভব। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যা করতে হবে তা দার্শনিক দৃষ্টিতে বললে সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় – এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে দুরদৃষ্টি, অধ্যবসায় এবং কাজের অগ্রাধিকার নির্ণয়। মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যতের জন্য বিষয়টি (বিজ্ঞানে প্রবেশ করা) উম্মাহর নিজের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের মতই গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য স্টাডির লক্ষ্য হবে ডাটা সংগ্রহের পদ্ধতিবিজ্ঞান সংক্ষেপে বর্ণনা করা যা থেকে বের হয়ে আসবে প্রাসঙ্গিক সংখ্যা ও পরিসংখ্যান। এসব ডাটার উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ও সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে ঘিরে কতিপয় পরিমিত ও উচ্চাকাংখী সুপারিশ প্রণীত হতে পারে যার

মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখিত দুটি বিষয় (পদার্থ বিদ্যা ও পাকিস্তান) অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যতদূর সম্ভব, ঐ সকল পর্যবেক্ষণের উপর একটা ব্যাপক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. যদি দেখা যায় যে, মুসলমানদের বিজ্ঞান চর্চায় ভাটা পড়েছে, তাহলে তার কারণ খুঁজে বের করার বিশেষ প্রচেষ্টা নিতে হবে।

২. 'জ্ঞান ব্যবসায়' যা সকল ব্যবসার শ্রেষ্ঠ ব্যবসা, মুসলিম বিশ্বের বিনিয়োগের লক্ষ্যে গঠনমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টি আলোচনা করতে হবে।

৩. বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা এবং জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে এর ধারাবাহিক অগ্রগতি কাজে লাগানোর উপায় বের করার চেষ্টা করতে হবে;

৪. পরিশ্রম যাতে পণ্ড না হয় এবং সম্পদের অপচয় না ঘটে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৪। নিবিড় সান্নিধ্য

ইনভেনটরি প্রস্তুতির কাজটি প্রাথমিক কাজ। একজন মুসলিম বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনের ইসলামায়নের জন্য আরো সামনে এগোতে হবে। এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যে পরিবেশে ইসলামী মূল্যবোধ চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং ইসলামায়নের অনুশীলন সম্ভব হয়। উপরের অনুচ্ছেদসমূহে যে জরীপের কথা আলোচনা করা হল তার ফলাফলের আলোকে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যেখানে এ ধরনের পরিবেশ রক্ষা করা যায়। আর এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে এগিয়ে আসতে হবে সমকালীন খ্যাতনামা স্কলারদেরকে যাদের সান্নিধ্যে থাকবে প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ স্কলারবৃন্দ। এদের লক্ষ্য হবে বিজ্ঞানের অন্বেষণ ও উন্নয়ন।

ক. বিনয়

একজন তরুণ বিজ্ঞানীর ক্যারিয়ার নির্মাণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সমকালীন বড় বড় বিজ্ঞানীদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করা। বড় বড় বিজ্ঞানীদের সাথে তাদের ছাত্র বা শিষ্যদের যখন নিবিড় যোগাযোগ ও সান্নিধ্য স্থাপিত হয় এবং তা দীর্ঘদিন টিকে থাকে ছাত্রদের পরিপক্কতা অর্জন পর্যন্ত, তখন ঐ শিষ্যরাই হয়ে ওঠে এক একজন নামকরা বিজ্ঞানী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষকের চেয়েও গুণে-মানে শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থানে চলে যেতে পারে। বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে তাকালে জ্ঞান বিতরণের এরূপ অনেক নজির আমরা পেতে

পারি। এ বক্তব্যের সমর্থনে আমি উনিশ ও বিশ শতকের কেমিষ্টদের একটা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলাম নিচের চিত্রে।

চিত্র-২

Lavoisier
Gay-Lussac
Liebig
Kekule
Von Bayer
Willstatter Wieland Buchner Fischer
Kunn Lynen Diels Warburg Windaus
Alder Butenandt
Meyerhof Krebs Theorell
Lipmann Ochoa
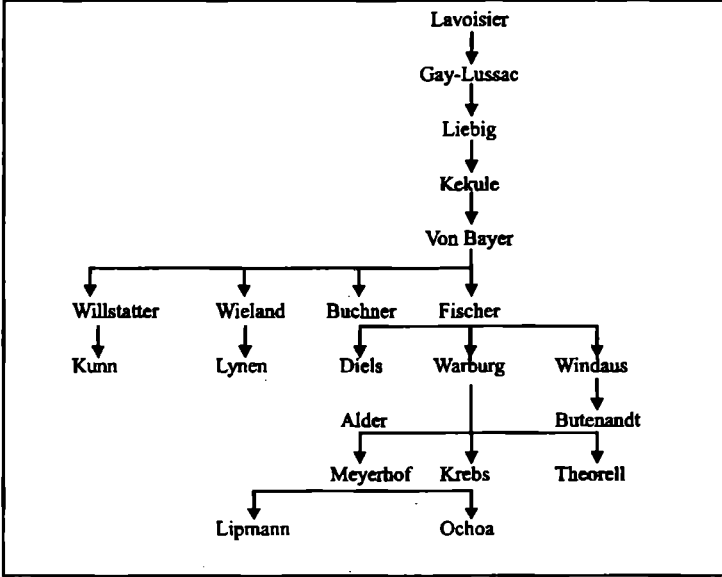
এ যোগাযোগ এখন শিক্ষার পোষ্ট গ্রাজুয়েট ও পোস্ট ডক্টরাল পর্যায় এবং পার্সোনালাইজড প্রশিক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করেছে।

শুধুমাত্র কয়েকটা লেকচার কোর্সে পাঠিয়ে এবং কিছু বই পুস্তক পড়িয়েই কাউকে বিজ্ঞানী বানানো যায় না। এর জন্য প্রয়োজন সকলকে একসাথে কয়েক বছর যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার কাজে নিয়োজিত থাকা। এ প্রক্রিয়ায় যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া গেলে চমৎকার ফল পাওয়া সম্ভব। শুধুমাত্র তথাকথিত সেন্টার গড়ে তোলার লক্ষ্যে বড় বড় ইমারত নির্মাণ করে পেশাগত সুখ্যাতি অর্জন সম্ভব নয়। ইতিহাসে এর কোন নজির নেই। কোন প্রতিষ্ঠানে যদি অসাধারণ যোগ্যতা ও গুণ সম্পন্ন মানুষ না থাকে অর্থাৎ সবাই যদি সাধারণ মানের হয় তাহলে তারা মনে করে যে তারা যথেষ্ট যোগ্য এবং অন্য অনেকের চাইতে তারা শ্রেষ্ঠ। চারদিকে নিম্নবিত্ত দিয়ে পরিবেষ্টিত মধ্যবিত্তরা নিজেদেরকে অনেক বড় মনে করবে এটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে বিশালদেহী পালোয়ানও যখন দৈত্যের মুখোমুখি হয় তখন নিজেকে বামন মনে করে।

বিজ্ঞানের জগতে যারা স্মরণীয়, বরণীয় তাদের থেকে আমরা যা শিখতে পারি তা হল, 'নিজেদেবকে বিনয়ী করা এবং যারা অতি উদার মনের মানুষ, খোলামেলা কিন্তু

সুশৃঙ্খল কল্পনার অধিকারী, অত্যন্ত উৎসাহী ও নিবেদিত প্রাণ তাদের তুলনায় নিজেদেরকে বড় মনে না করা। এসব গুণের মধ্যে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ উপকরণ হল বিনয়। এর থেকে জন্ম নেয় আত্মসমালোচনার মন এবং শেখা ও উন্নতিকরার অব্যহত প্রচেষ্টা। নিচে উদ্ধৃত আল কুরআনের কয়েকটি আয়াতে একথার প্রতিফলন দেখা যায় :

﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾

'তোমরা অহংকার করো না।' (৩২ : ১৫)

﴿وَاسْتَكْبَرْ تُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

'আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ কর, তা হলে তোমাদের পরিণাম কী হবে? নিশ্চয়ই যালিম লোকদেরকে আল্লাহ কখনও হেদায়েত দান করেন না।' (৪৬ : ১০)

﴿فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ﴾

'তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ করল; আর তারা তো ছিল অহংকারী লোক।'

(৭১ : ৭৫)

﴿إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ - لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾

'তোমাদের ইলাহ একক ইলাহ। কিন্তু যারা পরকালকে মানে না তাদের দিলে আল্লাহর অস্বীকৃতি আসন গেঁথে বসেছে। আর তারা আত্ম অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।'

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সব কার্যকলাপ জানেন- গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ও। তিনি সেই লোকদিগকে আদৌ পছন্দ করেন না যারা আত্ম অহংকারে নিমজ্জিত।'

(১৬ : ২২, ২৩)

﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

'তারা পরস্পরের প্রতি দয়াশীল' (৪৮ : ২১)

খ. সাহস, পরিশ্রম ও ধৈর্য

বিনয় একটা উপাদান যা স্বনামধন্য শিক্ষকগণ তাদের ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। অপরদিকে, সাহস আরেকটি গুণ যা ছাত্ররা তাদের শিক্ষকদের নিকট থেকে শিখে। একজন বিজ্ঞানী যত বিনয়ীই হোন না কেন, সমকালীন বড় বড় সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা ও তা সমাধানের দিক নির্দেশনা দেয়ার মত সাহস তার থাকতে হবে এবং

সমাধানের লক্ষ্যে তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে নির্দিধায়। আগত সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য নতুন নতুন উপকরণ ও পদ্ধতি বের করতে হবে। ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই, প্রাপ্ত ফলাফল পরিষ্কার ও সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার কষ্ট স্বীকার এবং সব মিলায়ে পূর্ণ লাইফ স্টাইলকে সত্য মূল্যবোধের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। বড় বড় বিজ্ঞানীরা তাদের অসাধারণত্ব অর্জন করেন যশ-খ্যাতির জন্য নয়, বরং দিনরাত তথা সারাক্ষণ সৃজনশীল কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রেখে এবং বিশ্রামের কথা ভুলে যেয়ে (মাত্র ৩/৪ ঘন্টা ঘুমিয়ে) তারা এ পর্যায়ে পৌছতে সক্ষম হন। সৃজনশীল কর্মকাণ্ড শুরু হয় ব্যাপক কল্পনা দিয়ে যার ভিত্তি হতে পারে পূর্বের উদ্ঘাটিত কোন তথ্য দিয়ে অথবা নতুনভাবে যাত্রা শুরুর মাধ্যমে। এ কাজে গ্রুপের ফেলো বিজ্ঞানীদের মধ্যে নিয়মিত মত বিনিময়ের মাধ্যমে ধারণা শেয়ার করা যেতে পারে। এভাবে সকল পর্যায়ের বিজ্ঞানীরাই কিছু না কিছু শিখতে পারে। ফেলো বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে শেখা যায়, শেখা যায় সিনিয়র ও মেন্টরদের কাছ থেকেও। ডিসটিংশন পাওয়ার জন্য কারো তদবির করার প্রয়োজন নেই। দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ধৈর্য ও সাহসের সাথে কঠিন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলে সেটা অর্জন করা সম্ভব। একজন মুসলিম বা মুসলিম বিজ্ঞানীর কালচারে এ বিষয়গুলো গ্রথিত থাকার কথা অথবা কমপক্ষে তার কালচারে এগুলো গ্রথিত করতে হবে। আল কুরআনে আমরা এ সম্পর্কে যেসব নির্দেশনা পাই সেগুলো দেখা যেতে পারে–

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾

'নিশ্চয়ই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষ কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে'। (৯০ : ৪)

﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ – أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾

'অতঃপর সে অন্তর্ভুক্ত হয় মুমিনদের মধ্যে এবং তাদের, যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারনের ও দয়ার। এরাই সৌভাগ্যশালী।' (৯০ : ১৭, ১৮)

﴿وَالْعَصْرِ – إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ – إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

'কালের শপথ, মানুষ মূলতঃ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। সেই লোকেরা ছাড়া যার ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একজন অপরজনকে হক উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্য ধারণের উৎসাহ দিয়েছে।' (১০৩ : ১ - ৩)

গ. সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

বিজ্ঞানের খ্যাতিমান পণ্ডিতদের সংস্পর্শ থেকে তাদের শিষ্যরা বিজ্ঞানের জন্য যা প্রয়োজন তা খুঁজে পায়। কথাটা পরিষ্কার করে এভাবে বলা যায় যে, বিজ্ঞানের যেসব শাখা নিয়ে গবেষণা করা দরকার তারা তা নির্বাচন করতে পারে, এ গবেষণালব্ধ ফলকে কিভাবে ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করতে হয় তা শিখতে পারে এবং শিখতে পারে কিভাবে এগুলোকে জ্ঞান দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া যায় বা সকল জ্ঞানের সাথে অর্জিত এ জ্ঞানের সমন্বয় ঘটানো যায়। এভাবে তাদের ছাত্ররা শুধু পদ্ধতি ও উপাত্তের সাথে পরিচিত হয় তাই নয়, বিজ্ঞানের মূল স্পিরিটের সাথেও তারা নিজদেরকে একাত্ম করতে শিখে যা খাঁটি স্কলার ও গবেষক হওয়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগে। বই পড়ে বা কোন শিক্ষকের কাছ থেকেও জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে, কিন্তু পাণ্ডিত্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে হলে অবশ্যই বড় মাপের শিক্ষকের সান্নিধ্যে যেতে হবে। একজন মুসলিম পণ্ডিতের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত তা আজ আর অজানা নেই। মহান শিক্ষক মুহাম্মাদ (ﷺ) জ্ঞানের অখণ্ড ও পূর্ণ ভাণ্ডার রেখে গেছেন তাঁর সাথীদের কাছে। তাঁর সাথীরা যা অর্জন করেছেন তা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী। এখন প্রয়োজন সাহাবায়ে কেরামের জ্ঞান অন্বেষণের প্রকৃতি ও ধারা বুঝার চেষ্টা করা, প্রতিভা বিশ্লেষণ করা এবং জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াকে বেগবান করা। একজন ছাত্র তার মহান শিক্ষকের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়ে থাকে কাজের আগ্রহ। কোন কাজের জন্য এটা একটা বিরাট শক্তি, যে শক্তি বলে একজন গবেষণা কর্মী গবেষণাকে শুধু একটি কাজ মাত্র মনে করে না, গবেষণাকে সে একটি অঙ্গীকার হিসেবে গ্রহণ করতে শিখে।

ঘ. সমাপনী বক্তব্য :

'হে মুমিনগণ; পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।' অর্থাৎ আল-কোরআনের আহ্বান হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে ইসলামী অনুশীলনের মধ্যে চলে এস এবং এ ব্যাপারে দ্বিধা-সংকোচ মনের মধ্যে রেখ না। তোমার চিন্তা, তোমার তত্ত্ব, তোমার কৃষ্টি, তোমার বিজ্ঞান, তোমার চাল-চলন, তোমার আচার-আচরণ, তোমার চেষ্টা-প্রচেষ্টা সবকিছুই হতে হবে ইসলামের শিক্ষা ও দাবি অনুযায়ী অর্থাৎ তোমার পুরো জীবনটাই হবে ইসলামের অধীন। নিজের জীবনকে তুমি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পার না। যেমন কখন ইসলামের হুকুম মানবে, আবার কখনও অন্য কিছু মেনে চলবে এটা হতে পারে না। এ অন্য কিছু মেনে চলা তথা অন্য কারো কথা ও আদর্শ নিজের জীবনে গ্রহণ করাটাই শয়তানের কাজ যে শয়তান তোমার প্রকাশ্য শত্রু।

মুসলমানদের সৌভাগ্য যে নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এর জামানা থেকেই বিভিন্ন কায়দায় ইসলামায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ইসলামী আইন শাস্ত্র এক্ষেত্রে সম্ভবত তত্ত্বগত ও

ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রেই সবচাইতে বেশি অগ্রসর। এ কারণে ইসলামায়ন নীতিমালার ক্রমবিকাশে ইসলামী আইন শাস্ত্রের রয়েছে অনন্য ভূমিকা। এটা সবাই জানে যে (১) আল্লাহর বাণী কুরআন, (২) রাসূল (ﷺ) এর জীবনাদর্শ- হাদীস, (৩) সাহাবা ও উম্মাহর ঐক্যমত্য- ইজমা, (৪) এবং যুক্তি ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো- কিয়াস এ চারটি বিষয় হচ্ছে ইসলামায়নের মূলনীতি। এর বাইরে রয়েছে আরো ৫টি সহায়ক নীতিমালা। সেগুলো হল- (১) জরুরত, (২) সময়ের প্রয়োজন (মুসলাহাহ) বা জনস্বার্থ (ইসতিসলাহ) (৩) ধারাবাহিকতা (ইসতিহাব) (৪) অগ্রাধিকার নীতিমালা (ইসতিহসান) এবং (৫) আইনগত চিন্তা-ভাবনা (রায়) বা জুরিসটিক স্পেকুলেশন। ইসলামের সঠিক বুঝ ও ধারণা এবং মূল বক্তব্য উপলব্ধি ছাড়া ইসলামায়ন সম্ভব নয়। উপরন্তু, একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ মডেল ইসলামায়নের কাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখানে এনালজি পদ্ধতিই একমাত্র উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ■

পরিশিষ্ট

ওয়ার্কশপ প্রোগ্রাম

শুক্রবার :

৩.৪৫ সালাত আল আসর

৪.০০ - ৬.০০ সেশন ১ (উদ্বোধন)
মডারেটর : তাহা জাবির আল আলওয়ানী
প্রতিবেদক : জামাল বারজিনজি
আব্দুল হামিদ আবু সুলাইমান
মূল বক্তব্য উপস্থাপন

৬.০০ - ৬.৩০ সালাত আল মাগরিব ও এশা, স্নাকস

৬.৩০ - ৮.০০ সেসন-২
মডারেটর : এম এ কে লোদী
প্রতিবেদক : ওয়ায়েল ফাহাদ,
এসাম ইসমাইল
প্রোফাইলস অব মুসলিম স্টুডেন্ট ইন (ইউএসএ) পপুলেশন এন্ড ওরিয়েন্টশন

এম ইয়ামিন জুবায়রি
দি প্রিনসিপল অব ইনট্রিনসিক অপরচুনিটি।

৮.০০ ডিনার এট দি গেষ্ট হাউস

শনিবার

৬.০০ - ৬.৩০ সালাত আল ফজর - দরসে কুরআন

৭.৩০ - ৮.০০ নাস্তা

৮.৩০ - ১০.০০ সেশন-৩
মডারেটর : সাইয়িদ এম সাঈদ
প্রতিবেদক : আহমদ তোতুনজি,
সাইয়েদ এম আমির
সাইন্টিফিক রিসার্চ ইন মুসলিম কান্ট্রিজ।

এস এইচ দুররানী
ইসলামিক ভ্যালুজ

১০.০০ - ১০.৩০ বিরতি

১০.৩০ - ১২.৩০ সেশন-৪
মডারেটর : হিশাম আলতালিব
প্রতিবেদক : মুস্তফা ফাহমী

এস ইমতিয়াজ আহমদ
পারসপেকটিভস অন নলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং

মুহাম্মদ ইসহাক জাহিদ
ইউজ অব ইসলামিক বিলিফস ইন ম্যাথমেটিকস এন্ড কম্পিউটার সায়েন্স এডুকেশন

১২.৩০-২.০০ সালাত আল জোহর ও লাঞ্চ

২.০০ - ৪.০০ সেশন-৫
মডারেটর : আহমদ তোতুনজি
প্রতিবেদক : মুহাম্মদ আনওয়ার
আদেল এ বাকের
এ ব্লুপ্রিন্ট ফর দ্য ইসলামইজেশন অব এটিচিউডস এন্ড প্রাকটিসেস ইন আথ সায়েন্সেস উইথ স্পেশাল এমফ্যাসিস অন গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি।
মাজহার হুসাইনি
ইসলামিক এটিচিউডস এন্ড প্রাকটিসেস ইন ফুড এন্ড নিউট্রিশনাল সায়েন্সেস।

৪.০০ - ৪.৩০ সালাত আল আসর; স্ন্যাক্স

৪.৩০ - ৬.০০ সেশন-৬
মডারেটর : আব্দুল রহমান আল মউদী
প্রতিবেদক- হাশিম আলতালিব,
এম এ কে লোদী
দি মেকিং অব এ সাইন্টিস্ট অর দি ইসলামাইজেশন অব এ মুসলিম সাইন্টিষ্ট

আলী কিরালা
দি ইসলামিক বেসিস অব কামিং মুসলিম টেকনোলজিক্যাল রেঁনেসা

৬.০০ - ৬.৩০ সালাত আল মাগরিব এন্ড এশা

৬.৩০ - ৮.০০ সেশন-৭
মডারেটর : আলী কিরালা
প্রতিবেদক : সাইয়িদ এম সাঈদ
তারিক এস নাজম
ইসলামিক ডাইরেকটিভস অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি
ইলহাম আল তালিব
ইসলামাইজেশন অব মেডিসিন
ডিনার এ্যাট গেষ্ট হাউস

রবিবার

৬.০০ - ৬.৩০ সালাত আল ফজর- দরসে কুরআন

৭.৩০ - ৮.০০ নাস্তা

৮.৩০ - ১০.০০ সেশন-৮
মডারেটর : ফারুক আব্দুল হক
প্রতিবেদক : ইকবাল ইউনুস
প্রতিবেদক কর্তৃক সামারি রিপোর্ট

১০.০০ - ১০.৩০ বিরতি

১০.৩০ - ১২ : ৩০ সেশন ৯ (সমাপনী)
মডারেটর : জামাল বারজিনজি
ফাইনাল সামারি এন্ড ফিউচার প্লান।
আব্দুল হামিদ আবু সুলাইমান
এম এ কে লোদী

১২.৩০ - ২.০০ সালাত আল জোহর, লাঞ্চ।

অনুবাদক পরিচিতি

মোঃ খায়রুল আলম ১৯৫৮ সনের ১লা মে মাগুরা জেলার সদর থানার শ্রীরামপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবাারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম আব্দুস সামাদ বিশ্বাস, মাতা মরহুমা মোমেনা খাতুন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স সহ এমএ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন।

ছোট বেলা থেকেই সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতি তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলাদেশ টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতায়ও তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও লেখার জগতে রয়েছে তার সফল পদচারণা, বিশেষ করে অনুবাদ কর্মে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনে পত্রিকাসহ দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনের ইসলামায়ন' শীর্ষক অনুবাদ গ্রন্থখানা তার লেখার জগতে একটি বিশেষ সংযোজন।

মোঃ খায়রুল আলম একজন সরকারী কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি নৌ বাহিনী সদর দপ্তরে উপ-পরিচালক (বেসামরিক) পদে কর্মরত।

ISBN
984-70103-0008-6